বিজ্ঞান পরিচয়

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্. এস্-সি.
ও
শ্রীশচীন্দ্রকুমার মিত্র, বি. এস্-সি.

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, as a Text-book for Class VII & VIII. Vide Notification No. Sly/79/54 dated 27th December, 1954.

বিজ্ঞান পরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

[সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম. এস্-সি.
কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক

ও

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মিত্র, বি. এস্-সি., বি. টি.
টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট (বিজ্ঞান)
শিক্ষক, কলিকাতা স্কটিশ চার্চ বিদ্যালয়

মূল্য এক টাকা দশ পয়সা মাত্র

3871

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

বায়ু

বায়ুর কথা

বায়ুর উপাদান ১

সোরাজান বা নাইট্রোজেন, অম্লজান বা অক্সিজেন, অঙ্গারাম্ল বা কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ৩

বায়ুতে অঙ্গারাম্লের অস্তিত্বের পরীক্ষা, বায়ুতে অম্লজানের অস্তিত্বের পরীক্ষা—

চুনের জল ও ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেটের সাহায্যে ৪

মোমবাতির সাহায্যে পরীক্ষা ৭

শ্বাসকার্য

বায়ু ও জীবজগৎ, অম্লজান ও শ্বাসকার্য ৮

অম্লজানের অভাবে শ্বাস বন্ধ হয় ১০

লোহার মরিচা

পরীক্ষা ১১

দহন

বায়ু ও দহন, পরীক্ষা ১৪

প্রাণীর শ্বাসকার্য ও দহন ১৬

দহন ও মরিচার তুলনা ১৭

বিষয় পৃষ্ঠা

বায়ু-সঞ্চলন

বায়ু-প্রবাহ ১৭
বায়ু-সঞ্চলনের নিয়ম ১৮
বায়ু-সঞ্চলন ও মানব-স্বাস্থ্য, বাসগৃহ ও রন্ধনগৃহে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা ১৯
উত্তপ্ত বায়ুর উর্ধ্বগতি ও শীতল বায়ুর নিম্নগতি ২০
বায়ু-চালিত যন্ত্র—শক্তির উৎস ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

জল

জলের কথা

জলের ধর্ম ২৪
জলের উপাদান ২৫
জলপ্রাপ্তির বিভিন্ন সূত্র ২৬
থিতান ও আস্রাবণ ২৮
পরিস্রাবণ ২৯
পাতন ৩১
জীবাণুনাশন, জীবজীবনে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা ৩৩

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ

মৌলিক পদার্থ ৩৪
যৌগিক পদার্থ, মিশ্র পদার্থ, সাধারণ মিশ্রণ ৩৫
রাসায়নিক সংযোগ, যৌগিক পদার্থের লক্ষণ.... ... ৩৬
বায়ুর মূল উপাদানের ধর্ম ৩৮
জলের মূল উপাদানের ধর্ম ৩৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
জলের দ্রাব্যতা	....	....	৪০
আদ্রতা, বৃষ্টি (জলচক্র), মেঘ, কুয়াশা, শিশির, তুষার			৪২
খরজল ও মৃদু জল	...	...	৪৫
খরজলকে মৃদু করিবার প্রণালী	...	....	৪৬
শক্তির উৎস—জলচালিত যন্ত্র ও বাঁধ		....	৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

শক্তি

শক্তি, শক্তির প্রকার-ভেদ	...	....	৪৯
শক্তির রূপান্তর	...	....	৫০
শক্তির উৎস	....	....	৫১
যন্ত্র ও দেহযন্ত্র	...	...	৫২
তাপশক্তি			
তাপের উৎস	...	...	৫৩
তাপের ক্রিয়া			
তাপের দীপ্তি, তাপের দহন	....	...	৫৫
তাপে অবস্থার পরিবর্তন, তাপে আয়তনের পরিবর্তন		....	৫৬
তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি	....	...	৫৮
তাপমান যন্ত্র	....	....	৬০
বিভিন্ন প্রকার থার্মমিটার	...	...	৬৩
তাপ-সঞ্চালন			
তাপের পরিবহণ	....	...	৬৪
পরিচলন	...	....	৬৫
বিকিরণ, সু-পরিবাহক ও কু-পরিবাহক	....	....	৬৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
আলোক			
আলোক বিকিরণ	....	....	৬৮
অঙ্গার-আত্মীকরণ	....	....	৬৯
চতুর্থ অধ্যায়			
জীব			
জীব ও জড়ের প্রভেদ	....	....	৭২
উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনা	....	....	৭৫
উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণী-বিভাগ	....	....	৭৭
মটর গাছ পর্যবেক্ষণ	....	....	৮২
মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গম	....	....	৮৩
মূলের কাজ	....	....	৮৪
কাণ্ডের কাজ, কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ	....	....	৮৫
পাতার কাজ	....	....	৮৬
ফুলের কাজ	....	....	৮৭
সরল উদ্ভিদ ও প্রাণী			
সরল উদ্ভিদ, ঈস্ট	....	...	৮৯
আমিবা	....	....	৯১
মস	....	....	৯২
মানব-দেহ	....	....	৯৩
পরিপাক-তন্ত্র	...		৯৯
শ্বাসতন্ত্র	...	...	১০২
রেচনতন্ত্র	....	....	১০৫

বিষয় পৃষ্ঠা

কয়েকটি সাধারণ রোগ

ম্যালেরিয়া	১০৭
বসন্ত	১০৯
কলেরা	১১১
খোস-পাঁচড়া	১১২

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক সাহায্য

আগুনে পোড়া	১১৩
মচকান ও ভাঙ্গা, ক্ষত ও রক্তপাত	১১৪
জলেডোবা ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া	১১৫
বৃশ্চিক দংশন, সর্প দংশন	১১৭
পাগলা কুকুরের দংশন ও জলাতঙ্ক রোগ	১১৮
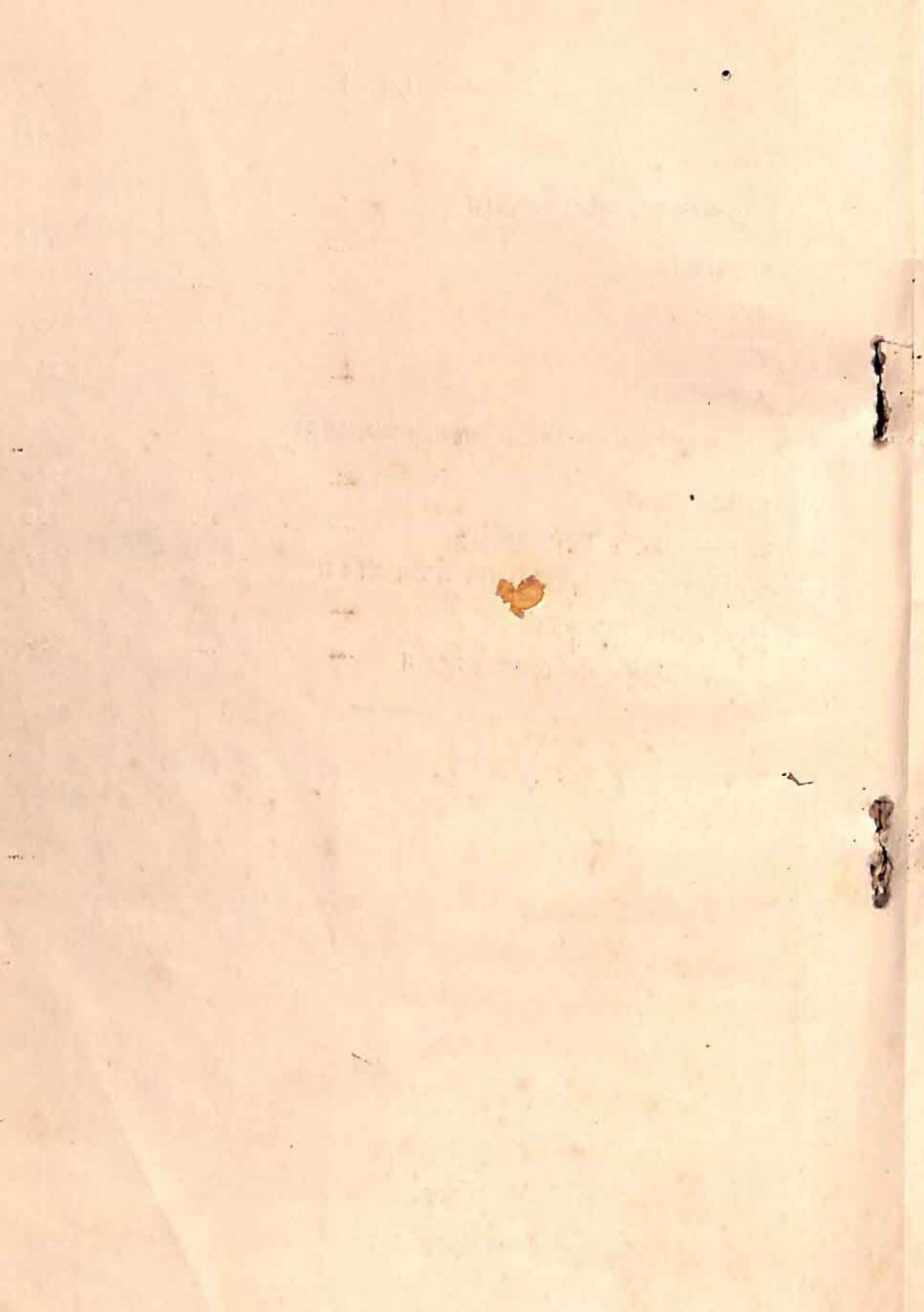
বিজ্ঞান পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

বায়ু

বায়ুর কথা

বায়ুঃ আমাদের এই জলস্থলময় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া বায়ুমণ্ডল অবস্থিত। আমরা বায়ুমধ্যে বাস করি। বায়ু আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর অস্তিত্ব নানাভাবে অনুভব করিতে পারি। গাছের পাতা নড়িলে, বা গায়ে বাতাস লাগিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে বায়ু বহিতেছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০০ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত লঘু বায়ুর অস্তিত্ব জানা যায়। বায়ু একটি মাত্র পদার্থ নহে ; ইহা কতকগুলি অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ। বাহ্যতঃ ইহাকে আমরা একটি পদার্থ মনে করি।

বায়ুর উপাদানঃ প্রধানতঃ দুইটি গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত অবস্থায় আছে। উহাদের একটি **সক্রিয়** ও অপরটি **নিষ্ক্রিয়**। এই সক্রিয় পদাথটি নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্য সকল দাহ্য পদার্থকে জ্বলিতে সাহায্য করে এবং ইহার সাহায্যে

প্রাণিজগৎ শ্বাসকার্য চালায়। নিষ্ক্রিয় পদার্থটির দ্বারা এই দুই কার্যের কোনটিই সম্ভব হয় না। বায়ুর আয়তনের পাঁচ ভাগের চারি ভাগই নিষ্ক্রিয়, এবং এক ভাগ মাত্র সক্রিয়। বায়ুর নিষ্ক্রিয় অংশের নাম **সোরাজান** বা **নাইট্রোজেন** ও সক্রিয় অংশের নাম **অম্লজান** বা **অক্সিজেন**। ইহা ছাড়া নিষ্ক্রিয় অংশে অল্প পরিমাণে **জলীয় বাষ্প, অঙ্গারাম্ল** বা **কার্বন ডাই-অক্সাইড, আর্গন, হিলিয়াম** প্রভৃতি গ্যাস আছে।

বায়ুর নির্দিষ্ট কোন আয়তন নাই। বায়ু যখন যে পাত্রে থাকে তখন সে পাত্রের সমস্তটা জুড়িয়াই অবস্থান করে; পাত্রের আয়তনই বায়ুর আয়তন।

বায়ুতে এইসকল গ্যাস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়া আছে। কিন্তু সময় ও স্থান-বিশেষে ইহার পরিবর্তন দেখা যায়। শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হয়। আবার স্থানভেদে, যেমন কলকারখানাপূর্ণ শহরে বা খনির মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণতঃ কম হয়। বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থগুলি বায়ুতে প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অবস্থায় থাকে।
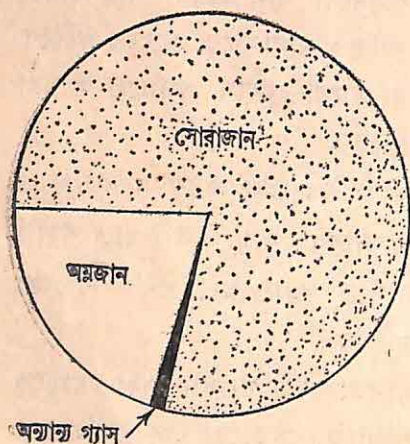
বায়ুর উপাদান

বালি ও চিনির মিশ্রণে উভয়ের দানা যেমন পাশাপাশি থাকে,

জল ও দুধের মিশ্রণে যেমন জল ও দুধের কণাগুলি পাশাপাশি থাকে, বায়ুতে তেমনি বিভিন্ন উপাদানের অণুগুলি পাশাপাশি অবস্থান করে।

সোরাজান বা নাইট্রোজেনঃ বায়ু হইতে অক্সিজেন দূর করিতে পারিলে সোরাজানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সোরাজান বায়ুর প্রায় চতুঃপঞ্চমাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং উহার ভিতরে কোন জিনিস জ্বলিতে পারে না।

অম্লজান বা অক্সিজেনঃ বায়ু ছাড়া আগুন জ্বলে না। বায়ুর অম্লজানই এই দহনকার্যে সাহায্য করে। অম্লজানহীন বায়ুতে আগুন নিবিয়া যায়। আমাদের শ্বাসকার্যও এই অম্লজানের সাহায্যেই হইয়া থাকে। বায়ুর অন্যান্য উপাদানগুলি দহনক্রিয়ায় বা আমাদের শ্বাসকার্যে কোন সাহায্য করে না।

অঙ্গারাম্ল বা কার্বন ডাই-অক্সাইডঃ বায়ুর নিষ্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে আঙ্গারাম্ল খুব সামান্য পরিমাণে থাকে। আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু দেহ হইতে বাহির করিয়া দেই, উহাতে অঙ্গারাম্ল থাকে। আঙ্গারাম্ল চুনের সহিত মিশ্রিত হইলে খড়িমাটি উৎপন্ন হয়।

জলীয় বাষ্পঃ সূর্য্যের উত্তাপে নদ-নদী ও সাগর উপ-সাগরের জল ক্রমাগত বাষ্প হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিতেছে। এই জলীয় বাষ্প বায়ুর সঙ্গে অদৃশ্যভাবে মিশিয়া থাকে। একটি গ্লাসের ভিতরে কিছু বরফ রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে গ্লাসের বাহিরের গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত জল জমিতেছে। ঐ জলবিন্দুগুলি বায়ুর জলীয় বাষ্প। গ্লাসের ঠাণ্ডা গায়ে লাগিয়া আবার জলকণায় ঘনীভূত হইয়াছে।

(ক) বায়ুতে অঙ্গারাম্লের অস্তিত্বের পরীক্ষাঃ বাতাসে চুনের জল রাখিয়া দিলে তাহার উপর একটা পাতলা সরের মত পর্দা পড়ে। এই পর্দাটি একটি পাতলা খড়িমাটির স্তর। অঙ্গারাম্ল ও চুনের জলের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে খড়িমাটি উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষাটি তোমরা নিজে নিজে করিয়া দেখ। একটি বড় বোতলে কিছু পরিষ্কার চুনের জল লও। এবার একটি পিচকারি দিয়া ঐ চুনের জলে বায়ু দিতে থাক। কিছুক্ষণের ভিতরেই পরিষ্কার চুনের জল ঘোলা হইয়া উঠিবে। আরও কিছুক্ষণ ঐ জলে পিচকারি দিয়া বায়ু দিতে থাকিলে জলে সাদা সাদা গুঁড়া দেখা যাইবে। চুনের জলে যে চুন দ্রবীভূত অবস্থায় মিশিয়া থাকে তাহার সহিত বায়ুর অঙ্গারাম্ল মিশিয়া খড়িমাটির সৃষ্টি করে। ঐ সাদা গুঁড়াগুলিই খড়িমাটি। এই পরীক্ষাটি হইতে বুঝা যায় বায়ুতে সামান্য পরিমাণে অঙ্গারাম্ল আছে।
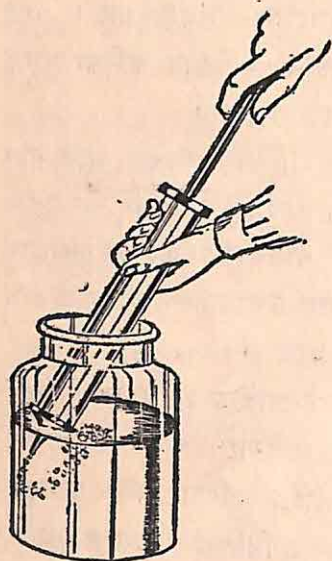
অঙ্গারাম্লের পরীক্ষা

(খ) বায়ুতে অম্লজানের অস্তিত্বের পরীক্ষা—চুনের জল ও ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেটের সাহায্যেঃ এই পরীক্ষাটির জন্য প্রথমতঃ ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রব্য নামে একটি পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহা বায়ুর অম্লজানকে শোষণ করে। ইহা বাজারে সাধারণতঃ ঔষধের দোকানে কিনিতে পাওয়া

যায়। একটি ১৮″ লম্বা দুই মুখ খোলা কাচের নল এবং নলের দুইদিক বন্ধ করিবার জন্য দুইটি রবারের ছিপি দরকার। এখন, কাচের নলের এক মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে চুনের জল মিশ্রিত কিছু ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রব্য ঢালিয়া দাও। অতঃপর অন্য মুখটিও ছিপি দিয়া বন্ধ কর।

এইবার কাচের নলটি উপরে নীচে করিয়া ঝাঁকাইতে থাক। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে পাইরোগ্যালেট দ্রব্যটির বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া
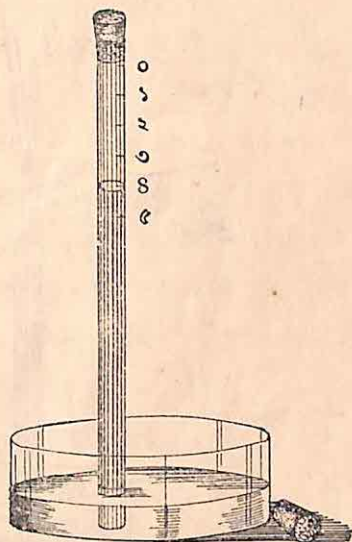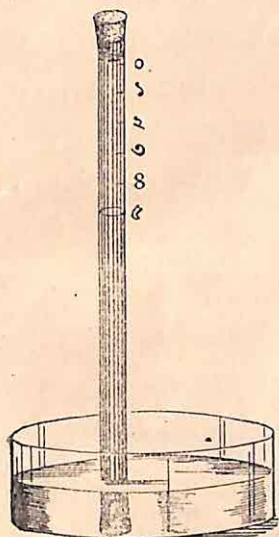
দুই মুখ বন্ধ নলে চুনের জল মিশ্রিত ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট

নলের বদ্ধ বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ জলে ভরা

বাদামী হইয়াছে। এখন একপাত্র জলের ভিতরে নলটিকে খাড়া অবস্থায় ধরিয়া রাখ। এইবার নীচের দিকে ছিপিটি খুলিয়া লও। উপরের দিকের ছিপিটি কিন্তু আটকানই থাকিবে। কিছুক্ষণের ভিতরেই দেখিবে নীচের পাত্র হইতে নলের নীচের দিকে কিছু জল

উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, নলের ভিতরে বদ্ধ বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ স্থান পাত্রের জলে ভরিয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় নলটির ভিতরের বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ কমিয়া গিয়াছে। ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট বায়ুর অম্লজানকে এবং চুনের জল অঙ্গারাম্লকে শোষণ করিয়া লইয়াছে। বায়ুর সেই শূন্য স্থানটি জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন নলটির ভিতর কেবল সোরাজান ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস রহিয়াছে। নলের ভিতরে আর অক্সিজেন গ্যাস বা
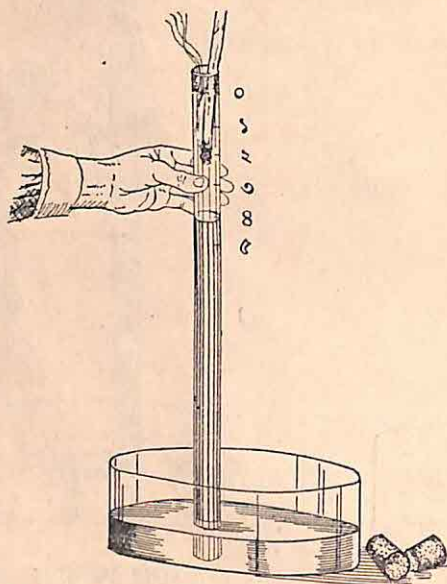
অঙ্গারাম্ল নাই। উপরের ছিপিটি খুলিয়া তাড়াতাড়ি একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি নলের ।ভতর প্রবেশ করাইয়া দাও। জ্বলন্ত কাঠিটি সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া যাইবে। এই পরীক্ষা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে বায়ুর অন্তর্গত সোরাজান ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি জ্বলন্ত শিখা নিবাইয়া দেয়।

(গ) মোমবাতির সাহায্যে পরীক্ষা ঃ একটি কাঠের ফালিতে এক টুকরা জ্বলন্ত মোমবাতি আটকাইয়া একপাত্র জলের মধ্যে কাঠটি ভাসাইয়া দাও। তারপর একটি দুই মুখ খোলা কাচের জার দিয়া মোমবাতিটিকে ঢাকিয়া দাও। দেখিবে জারের বাহিরে ও ভিতরে জল সমতলে আছে। এখন একটি ঢাকা দিয়া জারের উপরের খোলা মুখটি বন্ধ কর।

মোমবাতির পরীক্ষা
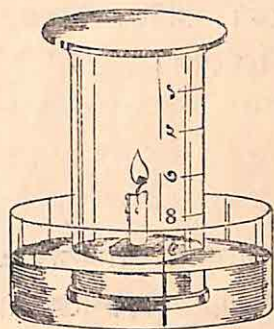
ঢাকিবার পরে দেখিবে মোমবাতির শিখাটি ধীরে ধীরে কমিয়ে একেবারে নিবিয়া গেল। এইবার দেখ জারের ভিতরকার বদ্ধ বায়ুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ স্থান পাত্রের জলে পূর্ণ হইয়া গেল। এখন আর পাত্রের ভিতরে ও বাহিরে জল সমতলে নাই। এখন যদি উপরের ঢাকা একটু
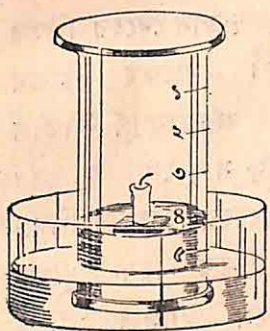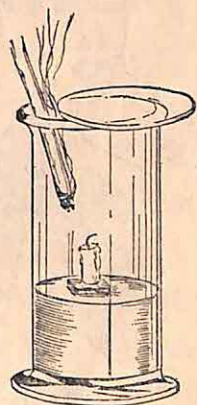
সরাইয়া একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি জারের ভিতরে ঢুকাইয়া দাও, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যাইবে। মোমবাতি জ্বলিবার ফলে জারের ভিতরকার বদ্ধ বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ অম্লজান সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে। এই এক-পঞ্চমাংশ স্থানটুকু অধিকার করিবার জন্য জারের বাহির হইতে

আগুন নিবিয়া যাইবে

জল ঢুকিয়া জারের মধ্যে জলতল উচ্চ হইয়াছে। জারের ভিতরে বায়ুর অবশিষ্ট চতুঃপঞ্চমাংশে সোরাজান প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে। সেইজন্য জ্বলন্ত কাঠিটি জারে প্রবেশ করাইবামাত্র উহা নিবিয়া গেল।

শ্বাসকার্য

বায়ু ও জীবজগৎ ঃ বায়ু ব্যতীত কোন জীব বাঁচিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বায়ুর অন্তর্গত সক্রিয় অম্লজানই জীব-জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

অম্লজান ও শ্বাসকার্য ঃ জগতের যাবতীয় জীব প্রশ্বাসের সহিত বায়ুর অম্লজান দেহের ভিতর টানিয়া লয়। নাকের ছিদ্রের ভিতর দিয়া অম্লজানপূর্ণ বাতাস আমাদের ফুসফুসে আসে। অপরদিকে, দেহের ভিতরের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া দূষিত রক্তও ফুসফুসে আসিয়া সঞ্চিত হয়। ফুসফুস রক্তের দূষিত পদার্থ-গুলিকে নিশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয় ও রক্তের সহিত নূতন অম্লজান মিশাইয়া দেয়।

শ্বাসকার্য

রক্তের সহিত এই অম্লজান দেহের সর্বত্র যায় ও দহনক্রিয়া চালাইয়া থাকে।

করিতে সাহায্য করে অর্থাৎ জ্বালাইয়া রাখে, সেইরূপ আমাদের দেহের ভিতরেও অম্লজানের সাহায্যে একটি দহনক্রিয়া ঘটিতে থাকে। ব্যাপারটা শুনিতে খুব আশ্চর্য মনে হইলেও অবিশ্বাস্য নয়। তোমরা বলিতে পার, যদি দেহের ভিতরে তেমন কোন আগুন জ্বলিবার মত ব্যাপার ঘটিত তবে সে আগুনের শিখা কোথায়? আর আগুনের তাপই বা কোথায়? একথা সত্য যে দেহের ভিতরে যে দহন বা জ্বলন হয় তাহাতে কোন শিখা দেখা যায় না, কিন্তু দহনক্রিয়ার ফলে কিছু তাপের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই আমাদের দেহ একটু উষ্ণ। দেহের সজীবতা ও উষ্ণতা এই দহনক্রিয়ারই ফল। মৃতদেহে কোন প্রকার সজীবতা ও উষ্ণতা থাকে না। শ্বাসকার্য বন্ধ হইলে রক্তে অম্লজানের অভাব হয়, দেহে দহনক্রীয়া বন্ধ হয়, জীবদেহ ঠাণ্ডা হয় এবং জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেহের ভিতরে দহনক্রিয়ার ফলে অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হয়। সেই অঙ্গারাম্ল, কিছু জলীয় বাষ্প ও কিছু তাপ আমাদের উত্তপ্ত নিশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

জলচর প্রাণী ও উদ্ভিদেরও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অম্লজানের প্রয়োজন হয়। গভীর জলের তলদেশে যে সব মাছ বিচরণ করে তাহারাও বায়ুর এই অম্লজান গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। বায়ু জলে ঈষৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সেই জন্য জলচর প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে অম্লজান পাওয়া সম্ভব হয়। মাছেরা ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত এই বায়ুর দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বায়ু ছাড়া কোন জীবই জীবন ধারণ করিতে পারে না।

জল ঢুকিয়া জারের মধ্যে জলতল উচ্চ হইয়াছে। জারের ভিতরে বায়ুর অবশিষ্ট চতুঃপঞ্চমাংশে সোরাজান প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে। সেইজন্য জ্বলন্ত কাঠিটি জারে প্রবেশ করাইবামাত্র উহা নিবিয়া গেল।

শ্বাসকার্য

বায়ু ও জীবজগৎ ঃ বায়ু ব্যতীত কোন জীব বাঁচিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বায়ুর অন্তর্গত সক্রিয় অম্লজানই জীব-জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

অম্লজান ও শ্বাসকার্য ঃ জগতের যাবতীয় জীব প্রশ্বাসের সহিত বায়ুর অম্লজান দেহের ভিতর টানিয়া লয়। নাকের ছিদ্রের ভিতর দিয়া অম্লজানপূর্ণ বাতাস আমাদের ফুসফুসে আসে। অপরদিকে, দেহের ভিতরের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া দূষিত রক্তও ফুসফুসে আসিয়া সঞ্চিত হয়। ফুসফুস রক্তের দূষিত পদার্থ-গুলিকে নিশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয় ও রক্তের সহিত নূতন অম্লজান মিশাইয়া দেয়।
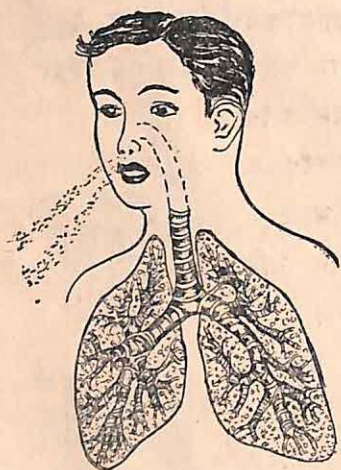
শ্বাসকার্য

রক্তের সহিত এই অম্লজান দেহের সর্বত্র যায় ও দহনক্রিয়া চালাইয়া থাকে।

একটি প্রদীপ জ্বালাইলে অম্লজান যেমন দাহ্য পদার্থকে দহন করিতে সাহায্য করে অর্থাৎ জ্বালাইয়া রাখে, সেইরূপ আমাদের দেহের ভিতরেও অম্লজানের সাহায্যে একটি দহনক্রিয়া ঘটিতে থাকে। ব্যাপারটা শুনিতে খুব আশ্চর্য মনে হইলেও অবিশ্বাস্য নয়। তোমরা বলিতে পার, যদি দেহের ভিতরে তেমন কোন আগুন জ্বলিবার মত ব্যাপার ঘটিত তবে সে আগুনের শিখা কোথায়? আর আগুনের তাপই বা কোথায়? একথা সত্য যে দেহের ভিতরে যে দহন বা জ্বলন হয় তাহাতে কোন শিখা দেখা যায় না, কিন্তু দহনক্রিয়ার ফলে কিছু তাপের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই আমাদের দেহ একটু উষ্ণ। দেহের সজীবতা ও উষ্ণতা এই দহনক্রিয়ারই ফল। মৃতদেহে কোন প্রকার সজীবতা ও উষ্ণতা থাকে না। শ্বাসকার্য বন্ধ হইলে রক্তে অম্লজানের অভাব হয়, দেহে দহনক্রীয়া বন্ধ হয়, জীবদেহ ঠাণ্ডা হয় এবং জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেহের ভিতরে দহনক্রিয়ার ফলে অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হয়। সেই অঙ্গারাম্ল, কিছু জলীয় বাষ্প ও কিছু তাপ আমাদের উত্তপ্ত নিশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

জলচর প্রাণী ও উদ্ভিদেরও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অম্লজানের প্রয়োজন হয়। গভীর জলের তলদেশে যে সব মাছ বিচরণ করে তাহারাও বায়ুর এই অম্লজান গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। বায়ু জলে ঈষৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সেই জন্য জলচর প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে অম্লজান পাওয়া সম্ভব হয়। মাছেরা ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত এই বায়ুর দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বায়ু ছাড়া কোন জীবই জীবন ধারণ করিতে পারে না।

অম্লজানের অভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ঃ বায়ুতে অম্লজানের অভাব ঘটিলে জীব বাঁচিতে পারে না। একটি পাত্রে একটি জ্বলন্ত বাতি আটকাইয়া দিয়া উহার উপর একটি কাচপাত্র চাপা দাও। এখন উহার মধ্যে একটি ছোট ইঁদুর ছাড়িয়া দিয়া উপুড় করা পাত্রটির কিনারা বরাবর চর্বি লাগাইয়া দাও। এখন, বাতির আগুনে পাত্রের ভিতরের অম্লজান পুড়িতে থাকিবে। চর্বির জন্য বাহিরের বাতাস ভিতরে ঢুকিতে পারিবে না। সমস্ত অম্লজানটুকু পুড়িয়া গেলে বাতিটি নিবিয়া যাইবে। তখন দেখা যাইবে, ইঁদুরটির শ্বাসকষ্ট হইতেছে এবং অনতিবিলম্বে অম্লজানের অভাবে ছটফট করিয়া ইঁদুরটি মরিয়া যাইবে। বায়ুতে অম্লজানের অভাব ঘটিলে আমাদেরও শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। এক ঘরে বহুলোক থাকিলে সাধারণতঃ বহুলোকের প্রশ্বাসের দ্বারা বায়ুর অম্লজান নিঃশেষিত হয় এবং ঘরের বায়ু নিশ্বাসের অঙ্গারাম্লে ভরিয়া যায়। এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস আমাদের শ্বাসকার্যে কোন প্রকার সহায়তা করে না। তখন যদি বাহিরের অম্লজানযুক্ত বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তবে ঘরের ভিতরের লোকদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। অনেক সময় এ অবস্থায় অম্লজানের অভাবে লোক অজ্ঞান হইয়া পড়ে; এমন কি খুব বেশীক্ষণ সে অবস্থায় থাকিলে মৃত্যু ঘটিতে পারে।
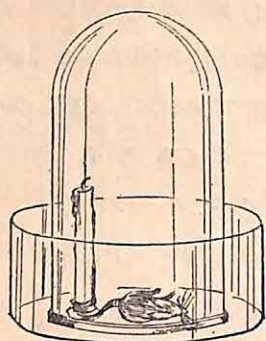
জারের ভিতরে ইঁদুর

লোহার মরিচা

মরিচা : তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ যে লোহা যদি কিছুদিন বাহিরে পড়িয়া থাকে তবে লোহায় জং ধরে। লোহায় জং ধরা আর মরিচা পড়া একই কথা। লোহায় কেন মরিচা পড়ে তাহা হয়ত তোমরা জান না। তোমরা জান, বায়ুতে অম্লজান আছে এবং জলীয় বাষ্পও আছে। বায়ুর এই অম্লজান ও জলীয় বাষ্পের সহিত লোহার রাসায়নিক সংযোগের ফলে ধীরে ধীরে লোহার পরিবর্তন ঘটিয়া **মরিচার** সৃষ্টি হয়। মোমবাতির জ্বলন বা দহনের মত মরিচাও একটি দহনক্রিয়ার ফল। ইহাতে সামান্য উত্তাপের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেহের মধ্যে অম্লজানের ক্রিয়ার ফলে যেরূপ তাপ উৎপন্ন হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। কিছু বেশী দিন ধরিয়া লোহা বাহিরের জল ও বায়ুর ভিতর থাকিলে সমস্ত লোহাটাই মরিচায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। মরিচা পড়িবার পূর্বে লোহার যে ওজন থাকে মরিচা পড়িবার পরে লোহার সে ওজন বৃদ্ধি পায়। বায়ুর অম্লজান লোহার সঙ্গে যুক্ত হয় বলিয়া লোহার ওজন বাড়ে।

লোহা মরিচায় পরিবর্তিত হইবার পর উহাতে লোহার কোন গুণ থাকে না। মরিচার উপর যদি একখণ্ড চুম্বক ধর তাহা হইলে দেখিবে যে চুম্বক মরিচাকে আকর্ষণ করে না। অম্লজান ও লোহার সংমিশ্রণে ইহা সম্পূর্ণ একটি নূতন পদার্থ হইয়াছে। ইহাতে লোহারও গুণ নাই এবং অম্লজানেরও গুণ নাই।

পরীক্ষা : কতকগুলি চক্‌চকে ছোট ছোট পেরেক বাজার হইতে কিনিয়া আন। নির্দিষ্ট ওজনের পেরেক এক টুকরা ভিজা কাপড়ে বাঁধিয়া ছোট একটি পুঁটলি প্রস্তুত কর। এবার পুঁটলিটা

একটা কাচের নলের মাথায় বাঁধ। তারপর নলটি একটি কাচের
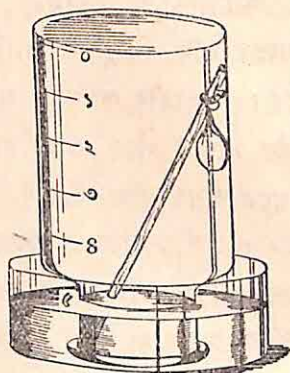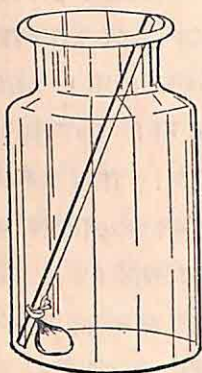
মরিচার পরীক্ষা

জারের ভিতর ঢুকাইয়া দাও। এখন কাচের জারটি উলটাইয়া একটি জলপাত্রের ভিতর বসাইয়া রাখ। লক্ষ্য রাখিবে জারের ভিতরে ও বাহিরে জল যেন একই সমতলে থাকে। দুই-তিন দিন পরে দেখিবে জারের মধ্যে জল উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। বদ্ধ জারের ভিতর যে বায়ুটুকু ছিল তাহার আয়তনের এক-পঞ্চমাংশ জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবার জারের ভিতরের বায়ুতে কি আছে পরীক্ষা করিয়া দেখ। জলের তলে হাত দিয়া জারের মুখটা একখানা কাচের চাকতি দিয়া বন্ধ করিয়া জল হইতে জারটিকে তুলিয়া
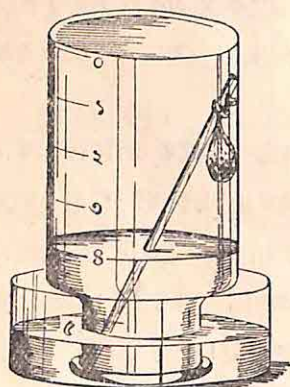
মরিচার পরীক্ষা

সোজা করিয়া বসাও। একটি পাটকাঠি জ্বালাইয়া যদি জারের মুখটা একটু ফাঁক করিয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দাও তাহা হইলে পাটকাঠিটি তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যাইবে। ইহাতে বুঝা গেল যে জারের ভিতরের বায়ুতে অম্লজান নাই। যদি অম্লজান থাকিত তাহা হইলে পাটকাঠিটি নিবিয়া যাইত না। এইবার পুঁটলিটি খুলিয়া দেখ পেরেকগুলি আর চক্‌চকে নাই; উহাদের উপর বাদামী রঙের মরিচা পড়িয়াছে। এবার পেরেকগুলিকে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইয়া সাবধানে ওজন করিলে দেখিবে, পেরেকের ওজন আগের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। জারের অন্তর্গত বায়ু অম্লজানশূন্য হইয়াছে এবং পেরেকগুলির ওজন বাড়িয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে লোহা বায়ুর অম্লজান শুষিয়া লইয়া মরিচায় পরিণত হয়।

দহন

দহন ঃ একখণ্ড কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে উহা কিছুক্ষণের মধ্যে পুড়িয়া যায় এবং ছাই অবশিষ্ট থাকে। কাঠ যখন জ্বলে তখন আলোক ও উত্তাপ দেয়। এইরূপ বাতি যখন জ্বলে তখনও উত্তাপ ও আলোক দেয়; তবে কাঠের মত উহাতে কোন ছাই অবশিষ্ট থাকে না। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর তার জ্বালাইলে খুব ধোঁয়া আর তীব্র সাদা আলোক ছড়াইয়া তারটি জ্বলিয়া যায় এবং খানিকটা সাদা ছাই পড়িয়া থাকে। কাঠ, বাতি ও ম্যাগনেসিয়াম তার ইত্যাদি যে সকল বস্তু অগ্নি সংযোগে জ্বলিতে থাকে তাহাদিগকে **দাহ্য পদার্থ** বলে।

জ্বলন্ত কাঠের উপর মাটি চাপা দিলে কাঠ আর জ্বলিবে না, আগুন নিবিয়া যাইবে। একটি গ্লাস দিয়া বাতিটি ঢাকিয়া রাখ, একটু পরেই বাতিটি নিবিয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বায়ু ছাড়া সাধারণতঃ কোন জিনিস জ্বলে না। গ্যাসের সাহায্যে কোন জিনিস পুড়িয়া যাওয়াকেই সাধারণতঃ জ্বলন বা দহন বলে। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোন রাসায়নিক সংযোগের ফলে তাপ ও আলোক সৃষ্টি হয় তাহা হইলে রাসায়নিক মিলনকেই **দহন** বলে।

বায়ু ও দহন ঃ সাধারণভাবে জ্বলন বা দহনের জন্য বায়ুর প্রয়োজন হয়। আমরা জানি বায়ুর ভিতরের সোরাজান ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় পদার্থ কোন দাহ্য বস্তুকে জ্বলিতে সাহায্য করে না। বায়ুর অন্তর্গত অম্লজানের সাহায্যেই দাহ্য বস্তু জ্বলে। দাহ্য বস্তুগুলি দহনক্রিয়ার সময় বায়ুর এই অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে।

পরীক্ষা ঃ (১) একটি পাত্রে কিছু জল রাখ। একটি চীনামাটির পাত্রে একটু গন্ধক লইয়া উহা জলপাত্রে ভাসাইয়া দাও। এবার ঐ গন্ধক জ্বালাইয়া দিয়া চীনামাটির পাত্রটি একটি জার দিয়া ঢাকিয়া রাখ। লক্ষ্য করিয়া দেখ, গন্ধকের খানিকটা পুড়িয়া নিবিয়া গেল, এবং জলপাত্রের জল ক্রমশ জারের ভিতর উঁচু হইয়া বদ্ধ স্থানের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। দহনক্রিয়ায় গন্ধক আবদ্ধ স্থানের বায়ুর অম্লজানের
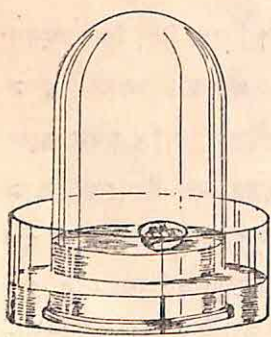
গন্ধকের দহন

সহিত মিলিত হইয়া একটি নূতন গ্যাস সৃষ্টি করে। এই নূতন গ্যাসটি খুব সহজেই জলে গলিয়া যায়। এখন ঐ জারের আবদ্ধ স্থানে বায়ুর অন্যতম প্রধান অংশে সোরাজান রহিয়াছে। জারের ভিতরকার বায়ুর চাপ কমিয়া যাওয়ায় বাহিরের বায়ুর চাপে জল জারের মধ্যে শূন্যস্থানের এক-পঞ্চমাংশ অবধি উঠিয়াছে।

এই পরীক্ষা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে বায়ুর ভিতরে যতক্ষণ অম্লজান ছিল ততক্ষণই গন্ধকের দহনক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। অম্লজান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কেবল সোরাজান ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকায় গন্ধক আর জ্বলিতে পারে নাই।

(২) এবার গন্ধকের পরিবর্তে চীনামাটির পাত্রে কিছু গুঁড়া ম্যাগনেসিয়াম ধাতু লইয়া আগের মত বাটিটি জলে ভাসাইয়া ম্যাগনেসিয়াম জ্বালাইয়া দাও এবং জার দিয়া ঢাকিয়া ফেল। এবার দেখ খুব উজ্জ্বল আলোক ছড়াইয়া ম্যাগনেসিয়াম পুড়িয়া নিবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জারের ভিতরটা সাদা ধোঁয়ায় ভরিয়া গেল এবং জল উঁচু হইয়া আবদ্ধ স্থানের এক-পঞ্চমাংশ ভরিয়া ফেলিল। পুড়িবার সময় ম্যাগনেসিয়াম আবদ্ধ বায়ুর অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া একটি নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিল। জারটি তুলিয়া দেখ, বাটির মধ্যে একটি সাদা জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে। এইটিই সেই নূতন পদার্থ। এই পরীক্ষাতেও সেই একই প্রমাণ পাওয়া যায় যে বায়ুতে অন্তত দুইটি গ্যাস আছে, তাহাদের একটি দহনের সহায়ক ও অপরটি দহনের প্রতিবন্ধক। আমরা জানি সোরাজান কোন পদার্থকে জ্বলিতে সাহায্য করে না। সুতরাং বায়ুর অম্লজানের সাহায্যেই দহনক্রিয়া ঘটে।

(৩) ঠিক একই পদ্ধতিতে তোমরা ইহার আগে একবার মোমবাতির পরীক্ষা করিয়াছ। সেই সময়েও দেখিয়াছ যে যতক্ষণ বাতাসে অম্লজান থাকে ততক্ষণই বাতিটি জ্বলে। অম্লজান শেষ হইয়া গেলে আর মোমবাতিটি জ্বলে না। এখানেও মোমবাতি দহনের সময় বায়ুর অম্লজান ও মোমবাতির অঙ্গার নামক উপাদান মিলিত হইয়া অঙ্গারাম্লের সৃষ্টি করে।

পর পর তিনটি পরীক্ষায় দেখা গেল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বদ্ধ বায়ুতে যতক্ষণ অম্লজান থাকে ততক্ষণই ঐ তিনটি পদার্থ জ্বলে এবং দ্রুত দহনকার্যের ফলে আলোক এবং উত্তাপ উৎপন্ন করিয়া এক নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে।

প্রাণীর শ্বাসকার্য ও দহন : নাসিকা ও ফুসফুসের সাহায্যে আমাদের দেহে প্রতিনিয়তই শ্বাসকার্য চলিতেছে। পোকা-মাকড় ইত্যাদির গায়ে যে সকল ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর দিয়াই পোকা-মাকড়েরা শ্বাসকার্য চালায়। মাছেরা তাহাদের ফুলকার সাহায্যে জলের ভিতরে যে বায়ু থাকে তাহা হইতেই শ্বাসকার্য চালাইয়া থাকে। যে ভাবেই হউক জীবের জীবন ধারণের জন্য শ্বাসকার্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তোমরা জান, আমরা শরীর রক্ষার জন্য যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তাহা দেহের ভিতর জীর্ণ হইয়া শক্তির সঞ্চার করে। খাদ্য পরিপাক করার সময়ও দেহের ভিতর এক প্রকার দহনকার্য চলে। খাদ্যদ্রব্য দহনের জন্য আমাদের যে অম্লজান আবশ্যক হয় তাহা আমরা প্রতি মূহূর্তেই প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি। এই অম্লজান ফুসফুসের ভিতরে রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত দেহের ভিতরে ছড়াইয়া পড়ে

এবং খাদ্যদ্রব্যের দহনে সাহায্য করিয়া থাকে। দেহের মধ্যে অম্লজানের সাহায্যে যে দহন হয় উহা মোমবাতি দহনের মত তীব্র নহে, অনেকটা লোহায় মরিচা ধরার মত ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। এই দহনের ফলে দেহের মধ্যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং তাপ উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয় বাষ্প রক্তের সহিত ফুসফুসে আসে ও নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। দহনের ফলে আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়, সেইজন্যই আমাদের নিশ্বাস-বায়ু ও গাত্রচর্ম উষ্ণ।

দহন ও মরিচার তুলনা ঃ বায়ুর অম্লজানের সহিত দাহ্য বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া দহনকার্য হয়। আবার, লোহা, জল ও বায়ুর অম্লজান গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে মরিচার সৃষ্টি হয়। সুতরাং দহনকার্য ও মরিচা পড়া মূলতঃ একই কাজ। তবে উহাদের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। (১) দহনক্রিয়াতে রাসায়নিক সংযোগ খুব দ্রুত হয় বলিয়া উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু মরিচা প্রস্তুত হইবার সময় দহনক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে হইতে থাকে বলিয়া উত্তাপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং আলোক উৎপন্ন হয় না। (২) সাধারণতঃ দহনকার্যে অগ্নি-সংযোগের প্রয়োজন হয় কিন্তু মরিচা প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নি-সংযোগের প্রয়োজন হয় না। দহন ও মরিচা পড়া আসলে এক কাজ হইলেও মরিচা ধরাকে ঠিক দহন না বলিয়া মৃদু-দহন বলা যাইতে পারে।

বায়ু-সঞ্চলন

বায়ুপ্রবাহ বায়ু সর্বত্র সমানভাবে ঘন নহে। নীচের বায়ু উপরের বায়ু অপেক্ষা ঘন। বায়ু উষ্ণ হইলে প্রসারিত হইয়া লঘু

হয় ও পার্শ্ববর্তী ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ুর চাপে উপরের দিকে উঠিয়া যায়, এবং ঠাণ্ডা ভারী বায়ু তাহার স্থান পূরণ করে। এইরূপে বাতাস বা বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, জ্বলন্ত অগ্নির শিখা ও ধূম উপর দিকে উঠে। ইহার কারণ তাপে বায়ু প্রসারিত ও লঘু হইয়া চতুষ্পার্শ্বের বায়ুর চাপে উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে এবং শিখা ও ধূম উষ্ণ বায়ুর চাপে উপর দিকে উঠিতেছে। চারিদিক হইতে যে ঠাণ্ডা বায়ু আসিতেছে, তাহাও আবার উষ্ণ হইয়া উপরে উঠিতেছে।

বায়ু সঞ্চলনের নিয়ম : সূর্যের উত্তাপে মাটি উষ্ণ হইলে তৎসংলগ্ন বায়ু উষ্ণ ও লঘু হইয়া উপরের দিকে উঠে এবং উপর হইতে শীতল বায়ু ঐ স্থানে নামিয়া আসে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে বায়ুর স্রোতের সৃষ্টি হয়। আমাদের ঘরের ভিতরে যে বায়ু আছে তাহাও উত্তপ্ত হইলে উপরের দিকে উঠিয়া কড়িকাঠের নীচের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং বাহিরের ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু দরজা-জানালা দিয়া ঘরের ভিতর ঢোকে। বাহিরে যখন বাতাস বহে না, তখনও বাহিরের বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ঘরের ভিতর শ্বাসকার্য ও নানা দহনক্রিয়ার ফলে বায়ু উষ্ণ ও লঘু হয় এবং বাহিরের বায়ু ভিতরে গিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করে। যদি উষ্ণ বায়ু বাহিরে যাইবার পথ না পায়, তাহা হইলে বায়ু-সঞ্চলনের কাজ ভালভাবে চলিতে পারে না, ঘর অম্লজানশূন্য শ্বাসকার্যের অনুপযোগী বায়ুতে পূর্ণ হয়। ঘরের দেওয়ালের উপর দিকে কতকগুলি ছিদ্র ও চারিদিকে জানালা থাকিলে ঘরের মধ্যে বায়ু-চলাচলের কোন ব্যাঘাত হয় না। এরূপ ঘরে বাস করিলে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না।

বায়ু-সঞ্চলন ও মানব স্বাস্থ্য ঃ গৃহে বায়ু-চলাচলের সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ খুব গভীর। যে ঘরে বায়ু-চলাচলের ভাল ব্যবস্থা নাই সে ঘরে বাস করিলে খুব সহজেই স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ে। আমরা প্রশ্বাসের সহিত বায়ুর অম্লজান গ্যাস টানিয়া লই এবং নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস ছাড়িয়া দেই। এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস আমাদের শ্বাসকার্যের কোন সহায়তা করে না। যে ঘরে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঢুকিতে পারে না এবং দূষিত বায়ু বাহির হইবার কোন পথ নাই, সে ঘরে কিছুক্ষণের মধ্যে বায়ুর অম্লজান শ্বাসকার্যের ফলে নিঃশেষিত হইয়া যায় ও ঘর অঙ্গারাম্লে ভরিয়া যায়। বেশীক্ষণ ঐরূপ ঘরে থাকিলে চোখজ্বালা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা বমি-বমি করা প্রভৃতি নানা রকমের উপসর্গ উপস্থিত হয়। দিনের পর দিন বায়ু-চলাচল-শূন্য ঘরে থাকিলে নানা প্রকার কঠিন রোগ হইয়া থাকে। বদ্ধ ঘরে আলো বা আগুন জ্বালিয়া রাখিয়া ঘুমাইবার ফলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বাসগৃহ ও রন্ধনগৃহে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা ঃ স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে ঘরের ভিতরে যাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে বায়ু চলাচল করিতে পারে সে ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত দরকার। বাসগৃহের দরজা-জানালা ঋজু ঋজু হইলে সহজে ঘরে বাতাস ঢুকিতে ও বাহির হইয়া যাইতে পারে। উত্তপ্ত দূষিত বায়ু যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য ঘরের কড়িকাঠের নীচে ফাঁক কিংবা ছাদের নীচে দেওয়ালে ঘুলঘুলির ব্যবস্থা থাকা দরকার। ইহাতে উপরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া যেমন ঘরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবার পথ পায়, তেমনই

হয় ও পার্শ্ববর্তী ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ুর চাপে উপরের দিকে উঠিয়া যায়, এবং ঠাণ্ডা ভারী বায়ু তাহার স্থান পূরণ করে। এইরূপে বাতাস বা বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, জ্বলন্ত অগ্নির শিখা ও ধূম উপর দিকে উঠে। ইহার কারণ তাপে বায়ু প্রসারিত ও লঘু হইয়া চতুষ্পার্শ্বের বায়ুর চাপে উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে এবং শিখা ও ধূম উষ্ণ বায়ুর চাপে উপর দিকে উঠিতেছে। চারিদিক হইতে যে ঠাণ্ডা বায়ু আসিতেছে, তাহাও আবার উষ্ণ হইয়া উপরে উঠিতেছে।

বায়ু সঞ্চলনের নিয়ম: সূর্যের উত্তাপে মাটি উষ্ণ হইলে তৎসংলগ্ন বায়ু উষ্ণ ও লঘু হইয়া উপরের দিকে উঠে এবং উপর হইতে শীতল বায়ু ঐ স্থানে নামিয়া আসে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে বায়ুর স্রোতের সৃষ্টি হয়। আমাদের ঘরের ভিতরে যে বায়ু আছে তাহাও উত্তপ্ত হইলে উপরের দিকে উঠিয়া কড়িকাঠের নীচের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং বাহিরের ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু দরজা-জানালা দিয়া ঘরের ভিতর ঢোকে। বাহিরে যখন বাতাস বহে না, তখনও বাহিরের বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ঘরের ভিতর শ্বাসকার্য ও নানা দহনক্রিয়ার ফলে বায়ু উষ্ণ ও লঘু হয় এবং বাহিরের বায়ু ভিতরে গিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করে। যদি উষ্ণ বায়ু বাহিরে যাইবার পথ না পায়, তাহা হইলে বায়ু-সঞ্চলনের কাজ ভালভাবে চলিতে পারে না, ঘর অম্লজানশূন্য শ্বাসকার্যের অনুপযোগী বায়ুতে পূর্ণ হয়। ঘরের দেওয়ালের উপর দিকে কতকগুলি ছিদ্র ও চারিদিকে জানালা থাকিলে ঘরের মধ্যে বায়ু-চলাচলের কোন ব্যাঘাত হয় না। এরূপ ঘরে বাস করিলে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না।

বায়ু-সঞ্চলন ও মানব স্বাস্থ্য : গৃহে বায়ু-চলাচলের সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ খুব গভীর। যে ঘরে বায়ু-চলাচলের ভাল ব্যবস্থা নাই সে ঘরে বাস করিলে খুব সহজেই স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ে। আমরা প্রশ্বাসের সহিত বায়ুর অম্লজান গ্যাস টানিয়া লই এবং নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস ছাড়িয়া দেই। এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস আমাদের শ্বাসকার্যের কোন সহায়তা করে না। যে ঘরে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঢুকিতে পারে না এবং দূষিত বায়ু বাহির হইবার কোন পথ নাই, সে ঘরে কিছুক্ষণের মধ্যে বায়ুর অম্লজান শ্বাসকার্যের ফলে নিঃশেষিত হইয়া যায় ও ঘর অঙ্গারাম্লে ভরিয়া যায়। বেশীক্ষণ ঐরূপ ঘরে থাকিলে চোখজ্বালা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা বমি-বমি করা প্রভৃতি নানা রকমের উপসর্গ উপস্থিত হয়। দিনের পর দিন বায়ু-চলাচল-শূন্য ঘরে থাকিলে নানা প্রকার কঠিন রোগ হইয়া থাকে। বদ্ধ ঘরে আলো বা আগুন জ্বালিয়া রাখিয়া ঘুমাইবার ফলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বাসগৃহ ও রন্ধনগৃহে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা : স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে ঘরের ভিতরে যাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে বায়ু চলাচল করিতে পারে সে ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত দরকার। বাসগৃহের দরজা-জানালা ঋজু ঋজু হইলে সহজে ঘরে বাতাস ঢুকিতে ও বাহির হইয়া যাইতে পারে। উত্তপ্ত দূষিত বায়ু যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য ঘরের কড়িকাঠের নীচে ফাঁক কিংবা ছাদের নীচে দেওয়ালে ঘুলঘুলির ব্যবস্থা থাকা দরকার। ইহাতে উপরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া যেমন ঘরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবার পথ পায়, তেমনই

নীচের দিকের দরজা ও জানালা দিয়া বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা বায়ু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। বাসগৃহে এইরূপ বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা থাকিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে না। শীতপ্রধান দেশে বাসগৃহে অগ্নিকুণ্ড থাকে। অগ্নিকুণ্ডের উপরে চিমনির ব্যবস্থা থাকে। চিমনির ভিতর দিয়া আগুনে উত্তপ্ত দূষিত বাতাস বাহির হইয়া যায় এবং জানালা দিয়া ঠাণ্ডা নির্মল বাতাস ঘরের ভিতর ঢোকে। এইরূপে বায়ু চলাচল করায় ঘরের বায়ু দূষিত হইতে পারে না। ঘরে বায়ু-চলাচলের জন্য শীতকালেও রাত্রিতে অন্তত একটি জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে ঘরের বায়ুতে অম্লজানের অভাব ঘটে না। উপরের ঘুলঘুলি দিয়া দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং সেই খোলা জানালা দিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে ঢোকে।

রন্ধনগৃহে উনানের উত্তাপে বায়ু ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়; কাঠ বা কয়লার আগুনে দহনকার্যের সময় ধুম ও অঙ্গারাম্লের উৎপত্তি হইয়া বায়ু দূষিত হয়। সেজন্য রান্নাঘরের দূষিত বায়ু বাহির হইবার জন্য উপরের দিকে যেমন ঘুলঘুলি থাকা দরকার, তেমনই নীচের দিকেও বাহিরের বিশুদ্ধ বাতাস আসিবার জন্য জানালা ও দরজা থাকা উচিত। রন্ধনগৃহে চিমনির ব্যবস্থা থাকাই সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা। আজকাল বড় বড় শহরে রান্নাঘরে চিমনির ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তপ্ত বায়ুর উর্ধ্বগতি ও শীতল বায়ুর নিম্নগতিঃ উত্তপ্ত বায়ু যে উপর দিকে উঠে এবং শীতল বাতাস নীচের দিকে নামে, তাহা আমরা নিম্নলিখিত পরীক্ষায় বুঝিতে পারি।

টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত বাতি বসাইয়া উহার উপর একটি তুইমুখ খোলা বিস্তৃত কাচের চিমনি রাখ ও উপরের খোলা মুখের ঠিক মাঝখানে T আকারের টিন ঝুলাইয়া দাও। এখন ঐ টিনটির তুইদিকে তুইটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি ধরিলে দেখিবে, একদিকের কাঠির শিখা নীচের দিকে নামিতেছে এবং অন্যদিকের কাঠির শিখা উপর দিকে উঠিতেছে।
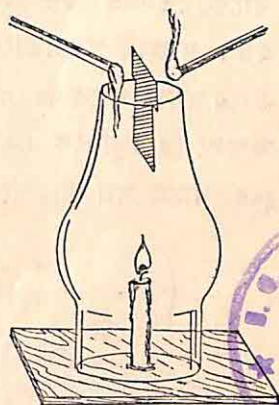
বায়ু-চালিত যন্ত্র—শক্তির উৎস

কাজ করিবার ক্ষমতার নাম শক্তি। পদার্থের সকল রকম নড়াচড়া ও গতি এই শক্তি দ্বারাই উৎপন্ন হয়। আমরা বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা রেল ও জাহাজ চালাই, বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা ট্রাম-গাড়ি চালাই ও পাখা ঘুরাই; সেইরূপ বাতাসের গতিশক্তিকেও নানা কাজে লাগাইয়া থাকি। নৌকায় পাল তুলিয়া বাতাসের গতিশক্তির সাহায্যে আমরা নৌকা চালাইয়া থাকি। মানুষ এক সময়ে বায়ুর এই গতিশক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য বায়ু-চালিতযন্ত্রের উদ্ভাবন করে। বাতাসে পালের সাহায্যে যেমন নৌকা চলে তেমনই বাতাসের সাহায্যে চাকা ঘুরাইবার চেষ্টা সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ু-চালিত যন্ত্রের আবিষ্কার হয়।

এক প্রকার কাগজের ফুল দেখা যায়, তাহাতে কাগজগুলি বাঁকা করিয়া বসান থাকে। উহাতে সম্মুখ দিক হইতে বাতাস লাগিলে ফুলটি ঘুরে। ঠিক এই পদ্ধতিতেই বায়ু-কল নির্মিত

হয়। বৈদ্যুতিক পাখায় যেমন কাঠ বা ধাতুর বাঁকা-বাঁকা ফলক থাকে, তেমনই কতকগুলি ফলক দিয়া একটি চাকা তৈয়ার করা হয়। চাকাটি খাড়াভাবে থাকে এবং ইহার অক্ষদণ্ডটি একটি ফ্রেমের উপর বসান থাকে। বাতাস লাগিলে চাকাটি ও অক্ষদণ্ডটি ঘুরে। অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে একটি খাঁজবিশিষ্ট স্ক্রু থাকে। অক্ষদণ্ডটি ঘুরিলে স্ক্রুর খাঁজে লাগিয়া পার্শ্ববর্তী আর একটি চাকার দাঁত ক্রমাগত একদিক হইতে অন্যদিকে ঘুরে। তাহাতে এই চাকার অক্ষদণ্ডটিও ঘুরে। এই অক্ষদণ্ডটির অধোভাগেও কতকগুলি দন্তযুক্ত চাকার ব্যবস্থা আছে। তাহাদের ঘূর্ণনের দ্বারা গতি উৎপাদন করিয়া নানা প্রকার কল চালান হয়। এইরূপ বায়ু-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে এখনও য়ুরোপের কোন কোন দেশে গম পিষিবার ও শস্যক্ষেত্রে জল দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বায়ু-চালিত যন্ত্রে বাতাসের এই শক্তিকে সকল সময় কাজে লাগান সম্ভব নহে। বাতাস সকল সময় একই দিকে বহে না। তজ্জন্য চাকার ফলকে সকল সময় ঠিকভাবে বাতাস লাগে না। আবার, বাতাস খুব ধীরে ধীরে বহিলে চাকাটিও ধীরে ধীরে ঘুরে ও তাহাতে কলের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য বর্তমান বৈদ্যুতিক যুগে বায়ু-চালিত যন্ত্র প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।
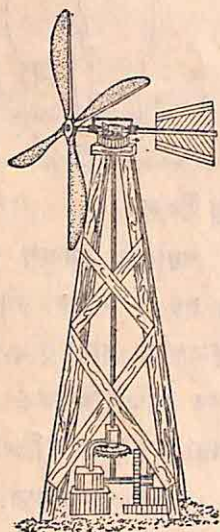
বায়ু-চালিত যন্ত্র

অনুশীলনী

১। বায়ুর উপাদান ও গঠন সম্বন্ধে যাহা জান বল।

২। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর ঃ—

(১) বায়ুতে অঙ্গারাম্ল আছে।

(২) বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ অম্লজান গ্যাস।

৩। মরিচা কি? ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়? লোহা অপেক্ষা মরিচার ওজন বেশী—পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ কর।

৪। দহনকার্য কাহাকে বলে? বায়ুর সঙ্গে দহনের কি সম্পর্ক বল।

৫। শ্বাসকার্যের সহিত বায়ুর কি সম্পর্ক বুঝাইয়া বল।

৬। স্বাস্থ্যের উপর বায়ু-চলাচলের প্রভাব বর্ণনা কর।

৭। বাসগৃহ ও রন্ধনগৃহে বায়ু-চলাচলের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার?

৮। উত্তপ্ত বায়ুর ঊর্ধ্বগতি ও শীতল বায়ুর নিম্নগতি পরীক্ষা করিয়া দেখাও।

৯। বায়ু-চালিত যন্ত্র সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

জল

জলের কথা

জল ঃ জীবজগতের প্রয়োজনের দিক হইতে বায়ুর পরেই জলের স্থান। পৃথিবীতে সেইজন্য জলের আয়োজন এত প্রচুর। ভূপৃষ্ঠের চারিভাগের প্রায় তিন ভাগই জল, ভূনিম্নে জল, আবার বায়ুমণ্ডলেও জল বর্তমান। এই জল আমরা তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাই—(১) বরফ ও তুষার জলের **কঠিন** অবস্থা; (২) সমুদ্র, নদ-নদী, পুকুর ইত্যাদিতে আমরা যে জল দেখিতে পাই উহা জলের **তরল** বা সাধারণ অবস্থা; এবং (৩) বায়ুর মধ্যে জল বাষ্পরূপে বর্তমান।
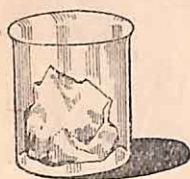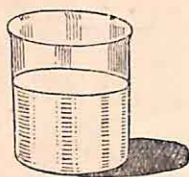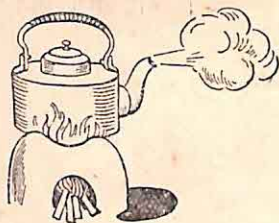
কঠিন বরফ তরল জল বাষ্প

জলের ধর্ম ঃ (১) বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ ও তরল পদার্থ। (২) জল যদি অল্প পরিমাণে লওয়া যায় তবে উহা বর্ণহীন মনে হয়। বিশাল সমুদ্রে জলের রং নীলাভ। (৩) অত্যধিক ঠাণ্ডায় জল জমিয়া কঠিন বরফ-রূপ ধারণ করে এবং উত্তাপে জল ফুটিয়া বাষ্প হয়। (৪) জল উপরের দিক

হইতে সর্বদা নীচের দিকে গড়াইয়া চলে। (৫) জলের ওজন আছে এবং নিজস্ব আকার নাই কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আছে।

পাত্রের আকারই জলের আকার

(৬) জলের উপরিভাগ সর্বদাই সমতল। (৭) জলের চাপ সব দিকেই সমান ভাবে বিস্তৃত হয়।
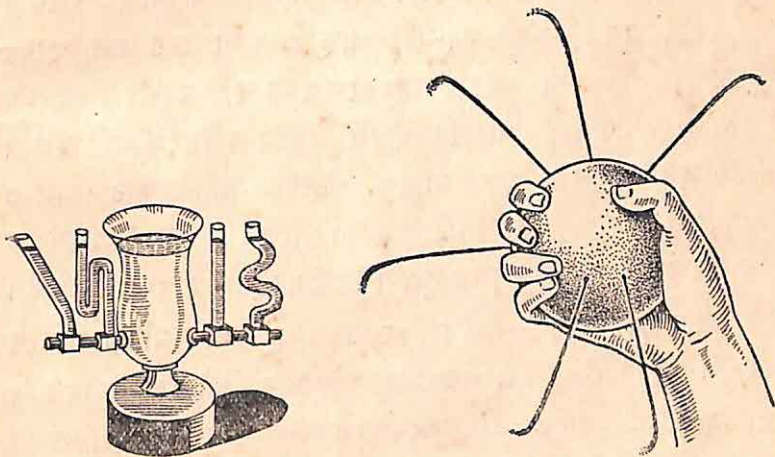
উপরিভাগ সমতল

সব দিকে সমান চাপ

জলের উপাদানঃ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। আয়তন হিসাবে জলের উপাদানে দুইভাগ **উদজান** বা **হাইড্রোজেন** গ্যাস ও একভাগ **অম্লজান** বা **অক্সিজেন** গ্যাস আছে। অম্লজান গ্যাস নিজে জ্বলে না কিন্তু জ্বলিতে

সাহায্য করে। কিন্তু জলের অপর উপাদান উদজান গ্যাস নিজে জ্বলে কিন্তু উহার ভিতরে জ্বলন্ত জিনিস নিবিয়া যায়। পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদজান ও অম্লজান হইতে জল প্রস্তুতকরা যায়।

জলপ্রাপ্তির বিভিন্ন সূত্র ঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে জলের প্রয়োজন হয় তাহা আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক জল হইতেই সংগ্রহ করি। নদ-নদী, হ্রদ, সমুদ্র ও বৃষ্টির জল হইতেই আমরা প্রাকৃতিক জল পাইয়া থাকি ইহা ব্যতীত পুকুর, খাল, বিল, কুয়া ও নলকূপ হইতে জল সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ আমরা যে জল ব্যবহার করি উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। এই সকল জলে উদজান ও অম্লজান ছাড়া অন্যান্য নানা পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

বৃষ্টির জল ঃ—সমুদ্র, নদ-নদী প্রভৃতি জলাশয়ের জল সূর্যের উত্তাপে জলীয় বাষ্প হইয়া বায়ুমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করে। এই মেঘ ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া শীতল হইলে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। বৃষ্টির জল পড়িবার সময় বায়ুতে ভাসমান নানা প্রকার গ্যাস ও ধূলাবালি ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। তথাপি প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত অন্যান্য জলের তুলনায় বৃষ্টির জলই অধিকতরবিশুদ্ধ।

প্রস্রবণের জল ঃ—বৃষ্টির জলের কিছু অংশ মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। এই জল অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে পৌঁছিয়া উহার ঢাল বাহিয়া চলিতে থাকে এবং অনেক সময় আবার কোথাও ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া আসে; তখন ইহাকে **প্রস্রবণ** বলে। মাটির নীচে বিভিন্ন ভূ-স্তরে নানা প্রকার দ্রবণীয় পদার্থ থাকে। ঐ সব পদার্থের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় জলে নানারূপ পদার্থ দ্রবীভূত হয়। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রস্রবণের জলের স্বাদ বিভিন্ন। বালি, মাটি ও কাঁকরের স্তর ভেদ করিয়া প্রবাহিত

হইবার ফলে জল পরিস্রুত হয়। সেই জন্য প্রস্রবণের জল দেখিতে খুব পরিষ্কার হয়।

নদীর জলঃ—প্রস্রবণ হইতেই ঝরনা ও নদীর সৃষ্টি হয়। নদীর জলে প্রস্রবণের জলের সমস্ত দ্রব্যই থাকে। ইহা ছাড়া বৃষ্টির জল নদীর দুই তীরের আবর্জনা আনিয়া নদীর জলের সঙ্গে মিশায়। সেজন্য নদীর জলে, বিশেষভাবে বর্ষাকালে, নানা প্রকার দূষিত পদার্থ মিশিয়া থাকে। নদীর মোহনার কাছে সমুদ্রের লবণাক্ত জল নদীর জলের সহিত মিশিয়া যায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল নদীর মধ্যে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

সমুদ্রের জলঃ—সমুদ্রের জল দেখিতে পরিষ্কার কিন্তু ইহাতে নানা জাতীয় লবণ দ্রবীভূত থাকে। অসংখ্য নদ-নদ সেই আদিম যুগ ধরিয়া পৃথিবীর মাটি হইতে এই সকল পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া আনিয়া সমুদ্রের জলে মিশাইতেছে। এই কারণে সমুদ্রের জল অত্যন্ত লবণাক্ত।

অন্যবিধ জলঃ—পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির জল নানা ভাবে দূষিত হয়। পানীয় জল হিসাবে যে-কোন উপায়েই জল সংগৃহীত হউক না কেন উহা বিশোধন না করিয়া ব্যবহার করা উচিত নয়। পুকুর, নদী ও খাল-বিলের জল কাদামাটির জন্য অনেক সময় ঘোলা হয়। তাহাতে খড়কুটা প্রভৃতি নানা রকমের আবর্জনা ভাসে। সেই জল পরিস্রুত না করিয়া কোন কাজে ব্যবহার করা চলে না। ব্যবহার্য জল বিশোধন করা উচিত। যে সব পদার্থ জলের সঙ্গে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া মিশিয়া থাকে তাহাদিগকে জল হইতে সহজে দূরীভূত করিতে পারা যায় না। যে সব পদার্থ জলে গলে না তাহাদিকে সহজেই জল হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। কাদা,

বালি, কাঠকুটা প্রভৃতি পদার্থসমূহকে সহজে জল হইতে দূরীভূত করিতে পারা যায়।

অপরিষ্কৃত ও অবিশুদ্ধ জলকে নির্মল ও বিশুদ্ধ করিতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয়।

থিতান ও আস্রাবণ (Sedimentation & Decantation) ঃ কাদামিশ্রিত ঘোলা জল কিছুক্ষণ একটি পাত্রে রাখিয়া দিলে পাত্রের তলায় ঐ কাদা থিতাইয়া সঞ্চিত হয়। কাদা জল হইতে ভারী বলিয়াই পাত্রের নীচে জমা হয়। যে সব ভারী কঠিন পদার্থ জলে একেবারে
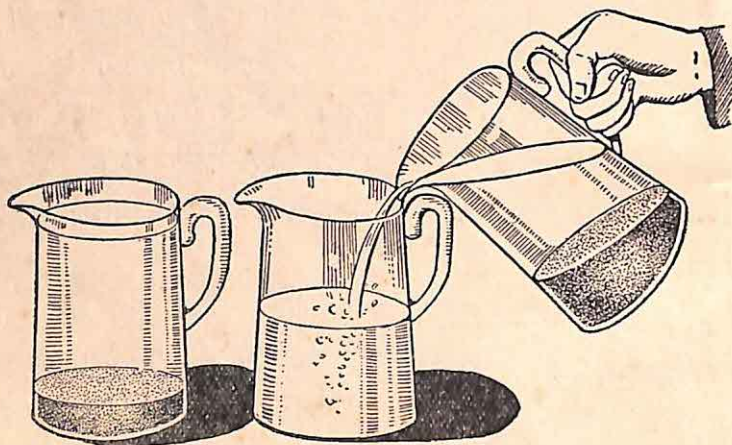
গলিয়া মিশিয়া যায় না তাহারা ধীরে ধীরে এইরূপে পাত্রের নীচে সঞ্চিত হয়। এইরূপে জলের অন্তর্গত কঠিন পদার্থের পাত্রের নীচে জমা হওয়াকেই **থিতান (Sedimentation)** বলে।

জলের কাদা প্রভৃতি আবর্জনা নীচে সঞ্চিত হইলে উপরিভাগে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। এই পরিষ্কার জলটুকু পাত্রটি কাত করিয়া ঢালিয়া লওয়ার নামই **আস্রাবণ (Decantation)**।

জলের মিশ্রিত ভাসমান পদার্থসমূহ যদি ভারী না হয় এবং থিতাইয়া নীচে না সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে বিশোধনের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

পরিস্রাবণ (Filtration) : জলে গলে না এবং ভাসিয়া বেড়ায় এরূপ কঠিন বস্তু জল হইতে পৃথক করিতে হইলে আমরা সাধারণতঃ এক টুকরা কাপড় বা ছাঁকনির সাহায্যে ছাঁকিয়া লই। এই প্রণালীকে **পরিস্রাবণ** (Filtration) বলা হয়। জলে মিশ্রিত পদার্থের কণাগুলি যদি খুব সূক্ষ্ম হয় তবে উহা কাপড় বা ছাঁকনির ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায় ; কাপড় বা ছাঁকনি দিয়া ছাঁকিয়া উহা পরিষ্কার করা যায় না। সূক্ষ্ম খড়িমাটির গুঁড়া-মিশান জল সাধারণভাবে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা যায় না। উহা পরিষ্কার করিবার জন্য এক প্রকার কাগজ ব্যবহার করা হয়। এই কাগজের
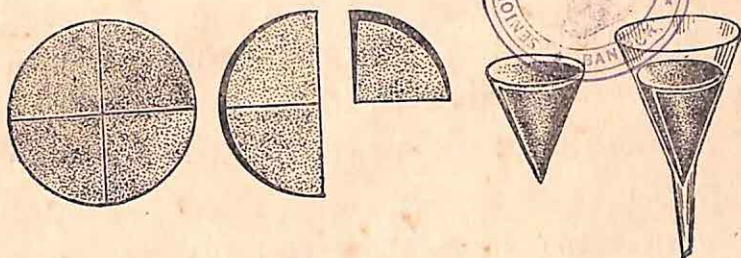
ফিল্টার-কাগজ ভাঁজ করার প্রণালী

নাম ফিল্টার-কাগজ (Filter Paper)। কাগজগুলি পাতলা ব্লটিং কাগজের মত। এই কাগজের সাহায্যে জল হইতে সূক্ষ্ম খড়ি-মাটি গুঁড়া পৃথক করা যায়। প্রথমে একখণ্ড ফিল্টার-কাগজ লইয়া গোল করিয়া কাট। এই গোল কাগজ-খণ্ডটিকে মাঝামাঝি দুইবার ভাঁজ কর। এরূপে চারিভাঁজ বিশিষ্ট যে কাগজ হইল, তাহার

একটি ভাঁজ খুলিয়া গোল করিয়া ফানেলের মুখে ভিতরের গায়ে আট-কাইয়া দাও। ফানেলটি একটি কাচের পাত্রের উপর বসাও। এখন খড়িমাটি-মিশ্রিত জল ধীরে ধীরে ফানেলের উপর ঢালিতে থাক। একটি কাচের দণ্ড যদি ফানেলের গায়ে ঠেকাইয়া সেই দণ্ডটির উপর ধীরে ধীরে জল ঢাল, তাহা হইলে ফিল্টার-কাগজ ছিঁড়িয়া যাইবার বা জল ছিটকাইয়া বাহিরে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না। লক্ষ্য করিয়া দেখ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পরিষ্কার জল ফানেলের ফিল্টার-কাগজ ভেদ করিয়া নীচের পাত্রে জমা হইতেছে। এই জলে খড়িমাটি বা অন্য কোন ময়লা নাই। সমস্ত ময়লা ও খড়িমাটি ফিল্টার-কাগজের গায়ে আটকাইয়া আছে।
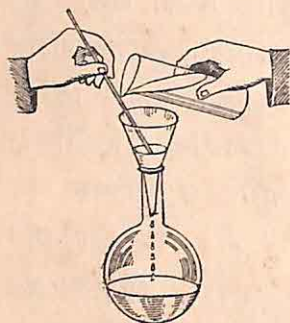
পরিস্রাবণ পদ্ধতি

অল্প জল এইরূপে পরিস্রাবণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশী জল এই প্রণালীতে পরিষ্কার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা করিতে হয়।

ব্যবহারের জন্য বালি ও কাঠকয়লার সাহায্যে জল পরিস্কৃত করা হয়। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে নদী ও পুকুরের ঘোলা জল নিম্নলিখিত উপায়ে সহজে ও কম খরচে পরিষ্কার করা হয়।

একটি মাটির টবে তলার দিকে একটি ছিদ্র করিয়া কাঠকয়লা দিয়া খানিকটা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর কিছু বালি দিয়া, আবার বালির উপর কাঠকয়লা দিয়া, পর পর কয়েকটি স্তরে কাঠকয়লা ও বালি সাজাইতে হয়। এক টুকরা পলিতা বা খড় টবের ছিদ্রে

লাগাইয়া তাহার নীচে একটি শূন্য পাত্র রাখা হয়। এখন টবের উপরে অপরিষ্কার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ঐ জল বালি ও কাঠকয়লার স্তর ভেদ করিবার সময় পরিষ্কৃত হইয়া নীচের পাত্রে সঞ্চিত হয়। এই প্রণালীতে যে সমস্ত কঠিন পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভাসমান অবস্থায় থাকে কেবল তাহাদিগকেই জল হইতে পৃথক করা যায়। কিন্তু জলে যদি লবণ বা চিনি দ্রবীভূত হইয়া মিশিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে পরিস্রাবণ প্রণালীতে পৃথক করা যায় না। লবণ-

সহজ প্রণালীর পরিস্রাবণ
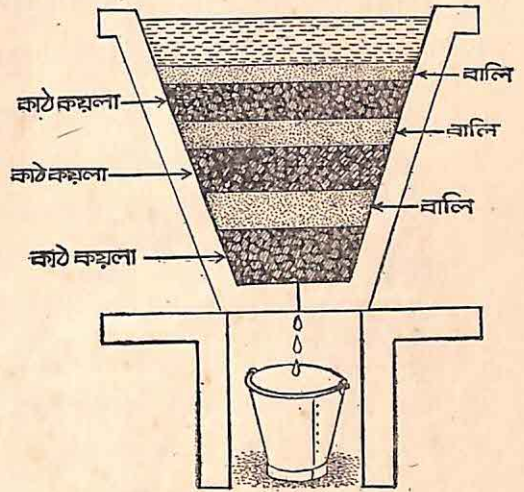
মিশ্রিত জল ফিল্টার-কাগজের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসে ও সেই জলের স্বাদ লবণাক্তই থাকে। জল হইতে লবণাদি পদার্থ দূরীভূত করিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত পাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি।

পাতন (Distillation) : জল উত্তাপে বাষ্প হয় ও বাষ্প শীতল হইলে আবার জলে পরিণত হয়। জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া আবার উহাকে জলে পরিণত করিবার প্রণালীকে **পাতন** বলে। জলের সহিত কিছু লবণ মিশাইয়া দাও লবণ

জলের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যাইবে যে জলের ভিতরে উহার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না। এই লবণাক্ত জল হইতে লবণ দূরীভূত করিতে হইলে বিশেষভাবে প্রস্তুত বকযন্ত্র ও কাচকুপি নামক কাচপাত্রের প্রয়োজন হয়। এই বকযন্ত্রের ভিতরে লবণ-জল ভরিয়া যন্ত্রের মুখে কাচকুপি পরাইয়া দাও। ঐ কাচকুপিটি একপাত্র ঠাণ্ডা জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। এইবার
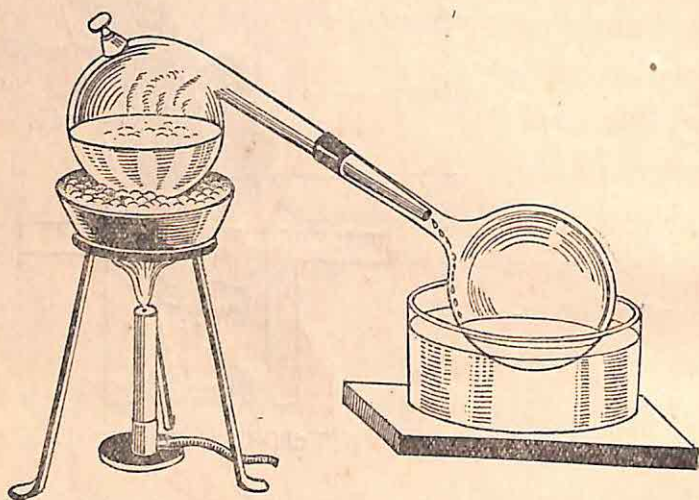
পাতন প্রণালী

বকযন্ত্রে তাপ দিতে থাক। দেখ, জল ফুটিয়া বাষ্প হইতেছে। বকযন্ত্রের নল দিয়া ঐ বাষ্প কাচকুপিতে যাইতেছে, এবং কাচ-কুপিটি ঠাণ্ডা জলে ডুবান আছে বলিয়া বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তরল জলে পরিণত হইতেছে। বকযন্ত্রের সমস্ত জল বাষ্প হইয়া গেলে উহাতে কেবল লবণ পড়িয়া থাকিবে। কাচকুপির জল মুখে দিয়া দেখ, সেই জলে আর লবণের স্বাদ নাই। উত্তাপে জলই শুধু প্রথমে

বাষ্প হইয়া পরে জলে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে জল বিশোধন করাকে **পাতন** (Distillation) বলা হয় এবং এই পরিস্রুত জলকে **পাতিত জল** (Distilled Water) বলে।

জীবাণুনাশন (Sterilization): আমাদের ব্যবহারের জল নানা ভাবে জীবাণুযুক্ত হয়। জীবাণুযুক্ত জল পান করিলে রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। যে প্রণালীতে জলের জীবাণু ধ্বংস করা হয় তাহাকে **জীবাণুনাশন** (Sterilization) বলে। জীবাণুযুক্ত জল আগুনের তাপে সিদ্ধ করিয়া লইলে উহার রোগজীবাণুগুলি উত্তাপে মরিয়া যায়। জীবাণুনাশের ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও নিরাপদ উপায়। পরিস্রাবণের প্রণালীতে জলের ময়লা দূর করা গেলেও জীবাণু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। রোগজীবাণু ধ্বংস করিতে হইলে জল ভাল করিয়া ফুটাইয়া লওয়া উচিত। ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারাও জল জীবাণুশূন্য করা যায়, কিন্তু উহাতে জলে গন্ধ হয় ও জল বিস্বাদ লাগে। সূর্যকিরণে যথেষ্ট **বেগুনী পারের আলো** (Ultra-violet Rays) আছে। এই আলো অত্যন্ত শক্তিশালী জীবাণুনাশক। নদী, পুকুর, খাল ইত্যাদির জলে সূর্যকিরণ প্রচুর পরিমাণে লাগিলে প্রাকৃতিক নিয়মে বেগুনী পারের আলোর সাহায্যে ঐ জল বিশোধিত ও জীবাণুশূন্য হয়। এই আলোর সাহায্যে জলের জীবাণুনাশ হইলে জলে কোন কৃত্রিম গন্ধ হয় না বা জল বিস্বাদ হয় না।

জীবজীবনে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা: পরিষ্কৃত ও পরিস্রুত জল জীবাণুমুক্ত হইলেই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়। পরিস্রুত জলে জীবাণু থাকিলে ঐ জলকে বিশুদ্ধ জল বলা চলে না। সাধারণ ভাবে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণু

জলের সাহায্যেই জীবদেহে সংক্রমিত হয় এবং রোগ বিস্তার করে। কাজেই পান ও রন্ধনের জল বিশেষভাবে বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। রোগ-সংক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এবং জল যাহাতে দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ না হয়, তজ্জন্য পরিস্রুত জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া জীবাণুমুক্ত করিয়া ব্যবহার করা উচিত। বিশুদ্ধ নির্মল জল যেমন আমাদের জীবনরক্ষার সহায়, দূষিত জীবাণুযুক্ত জল তেমনই আবার জীবননাশের কারণ। যখন কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হইতে থাকে তখন খুব সহজেই এই সব রোগের জীবাণু জলের সহিত মিশ্রিত হয়। রোগীর মলমূত্র, বমি ও কফ-কাশির সহিত রোগের জীবাণু নানাভাবে মানুষের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার ফলে জলে মিশ্রিত হয়। সেই জল বিশেষভাবে পরি-শোধিত ও বিশুদ্ধ করিয়া না লইলে ঐ সব রোগ সংক্রমিত হইয়া অকাল-মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয়। কাজেই জীবজীবনে প্রকৃত বিশুদ্ধ নির্মল জলের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ

পদার্থঃ এই পৃথিবীতে নানা প্রকার বস্তু দেখা যায়। যে বস্তুর ভার আছে, যাহারা স্থান অধিকার করিয়া থাকে এবং যাহাদের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যায় তাহাকেই পদার্থ বলে। আমাদের চারিদিকে যে সব পদার্থ দেখা যায় তাহাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(১) **মৌলিক পদার্থ** ও (২) **যৌগিক পদার্থ**।

মৌলিক পদার্থঃ যদি কোন পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে উহা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ পাওয়া না যায় তবে উহাকে **মৌলিক**

পদার্থ বলে। জল বিশ্লেষণ করিলে হাইড্রোজেন (উদজান) ও আক্সজেন (অম্লজান) গ্যাস পাওয়া যায়। সুতরাং জল মৌলিক পদার্থ নয়। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশ্লেষণ করা যায় না ; ইহারা মৌলিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থের ভিতরে আবার দুইটি ভাগ আছে। উহাদের কতকগুলি **ধাতু**, যেমন—সোনা, রূপা, লোহা ইত্যাদি ; আর কতকগুলি **অধাতু**, যেমন—অম্লজান, উদজান, গন্ধক ইত্যাদি। লোহা বা গন্ধক ইত্যাদি পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করিলে অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। সেইজন্যই উহারা মৌলিক পদার্থ।

যৌগিক পদার্থঃ দুইটি বা দুইটির বেশী মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে **যৌগিক পদার্থ** বলে। অম্লজান ও উদজানের রাসায়নিক সংমিশ্রণে জল উৎপন্ন হয় ; জল একটি যৌগিক পদার্থ। তদ্রূপ, লোহা হইতে জল ও বায়ুর সংযোগে যে মরিচা উৎপন্ন হয়, তাহাও যৌগিক পদার্থ।

মিশ্র পদার্থঃ দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ একসঙ্গে সাধারণ ভাবে মিশিয়া থাকিলে **মিশ্র পদার্থ** উৎপাদন করে। মিশ্রিত পদার্থে যে সকল মূল বা যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে উহাতে সেই সকল পদার্থের গুণ ও ধর্ম বর্তমান থাকে, যেমন—বায়ু, গন্ধক ও লোহার সাধারণ মিশ্রণ।

সাধারণ মিশ্রণঃ একটি পাত্রে খানিকটা লোহার গুঁড়া ও গন্ধকের গুঁড়া খুব ভাল করিয়া মিশাও। যখন এই দুইটি গুঁড়া খুব ভাল করিয়া মিশিয়া যাইবে তখন খালি চোখে দেখিয়া আর উহাদিগকে গন্ধক বা লৌহ বলিয়া মনে হইবে না। ঐ মিশ্র

পদার্থটির মধ্যে গন্ধককণা ও লোহার কণা পাশাপাশি রহিয়াছে; উভয়ে মিশিয়া কোন তৃতীয় পদার্থ হয় নাই। একটি জোরাল চুম্বক লইয়া পাত্রটির মধ্যে কয়েকবার ঘুরাও, দেখিবে, সমস্ত লোহার গুঁড়া চুম্বকের গায়ে আটকাইয়া গিয়াছে। গন্ধকের গুঁড়াগুলি পাত্রের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে লোহা ও গন্ধকের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে নাই। লোহা যেমন ছিল, তেমনই আছে; সেইজন্য চুম্বক উহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। উহার গুণের কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই প্রকার মিশ্রণকে **সাধারণ মিশ্রণ** বলে।

রাসায়নিক সংযোগঃ এই লোহার গুঁড়া ও গন্ধকের গুঁড়া যদি পরীক্ষা-নলে রাখিয়া নরম করা যায়, তাহা হইলে গন্ধকের গুঁড়া ও লোহার গুঁড়া গলিয়া মিশিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিবে। এই নূতন পদার্থটি শীতল হইলে কঠিন হইবে। তখন উহাকে গুঁড়া করিয়া উহার মধ্য দিয়া চুম্বক ঘুরাইলে এবার আর লোহা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া আসিবে না। সুতরাং এবার যাহা হইল তাহা সাধারণ মিশ্রণ নহে। ইহাকে বলে **রাসায়নিক সংযোগ**। এই নূতন পদার্থটি একটি যৌগিক পদার্থ।

যৌগিক পদার্থের লক্ষণঃ যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলি একেবারে নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। কোন কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। সাধারণ মিশ্রণে যত খুশি লোহার গুঁড়া ও গন্ধকের গুঁড়া মিশান যায় কিন্তু রায়ায়নিক সংযোগের বেলায় তাহা হইবার উপায় নাই। ইহাতে লোহা ও গন্ধকের ভাগ একেবারে নির্দিষ্ট। লৌহ-গন্ধকের যৌগিক পদার্থটিতে সাত ভাগ লোহা ও চারিভাগ গন্ধক থাকিতেই হইবে। ইহাই রসায়নের নিয়ম। পাত্রে যদি

তুমি আট ভাগ লোহা ও চারিভাগ গন্ধক মিশাইয়া রাসায়নিক সংযোগ ঘটাও, তাহা হইলে সাত ভাগ লোহা ও চারিভাগ গন্ধকেরই রাসায়নিক সংযোগ হইবে। এক ভাগ লোহা অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকিবে।

জল যৌগিক পদার্থ। জলের ভিতরেও উদজান ও অম্লজানের পরিমাণ নির্দিষ্ট। ওজন হিসাবে আঠার ভাগ জল লইলে তাহার ভিতরে দুই ভাগ উদজান ও ষোল ভাগ অম্লজান থাকিবেই।

মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্য ঃ

মিশ্র পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
১। উপাদানগুলি কখনও মিশিয়া এক হয় না।	১। উপাদানগুলি মিশিয়া এক হইয়া যায়।
২। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি সহজে পৃথক করা যায়।	২। যৌগিক পদার্থের উপাদান সহজে পৃথক করা যায় না।
৩। উপাদানের পরিমাণ নিদিষ্ট নয়।	৩। উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট।
৪। মিশ্র পদার্থে উপদানগুলির নিজস্ব গুণ ও ধর্ম বর্তমান থাকে।	৪। যৌগিক পদার্থের গুণ ও ধর্ম উপাদানগুলির গুণ ও ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।
৫। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি মিশ্রিত হইবার সময় তাপের কোন পরিবর্তন হয় না।	৫। যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিবার সময় তাপের পরিবর্তন হয়।

বায়ুর মুল উপাদানের ধর্ম : তোমরা জান বায়ু কতকগুলি গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ। ইহার মধ্যে **অম্লজান, সোরাজান, জলীয় বাষ্প, অঙ্গারাম্ল** ও আরও কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ বর্তমান। বায়ুর ভিতরে এই বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থগুলি নিজস্ব গুণ ও ধর্ম বজায় রাখিয়া মিশিয়া আছে।
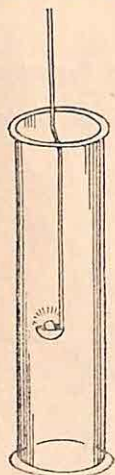
অম্লজান গ্যাসে দীপ্ত কাঠকয়লা তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিবে

অম্লজান বায়ুর একটি উপাদান। এই অম্লজান গ্যাসের কোন **বর্ণ** নাই, **স্বাদ** নাই বা **গন্ধ** নাই এবং জলে ইহা সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। ইহা **স্বচ্ছ** এবং **বায়ু অপেক্ষা ভারী**। অম্লজান **দহনকার্যের সহায়ক**। ইহা ব্যতীত কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। অম্লজান কোন মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইলে **অক্সাইড** বা **অম্ল** নামে যৌগিক পদার্থের গঠন করে। বায়ুতে অম্লজানের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিবার সময় তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ যে বায়ুতে অম্লজান না থাকিলে জ্বলন্ত পাটকাঠি উহাতে নিবিয়া যায়। কিন্তু জারের ভিতর একটি দীপ্ত কাঠকয়লা বা পাটকাঠি লাল থাকিতে থাকিতে যদি অম্লজানপূর্ণ গ্যাস প্রবেশ করাইয়া দাও, তাহা হইলে উহা আবার তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিবে। যে বস্তু বায়ুতে অল্প অল্প জ্বলে, অম্লজানে তাহা তীব্রভাবে জ্বলে।

সোরাজান বায়ুর একটি উপাদান। বায়ুর আয়তনের পাঁচ ভাগের চারি ভাগই সোরাজান। এই গ্যাসও অম্লজানের মতই **স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন** ও **স্বাদহীন**। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না বলিলেই চলে। একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি বা জ্বলন্ত গন্ধকের টুকরা

সোরাজানের ভিতর ধরিলে উহা তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যাইবে। অম্লজান ও সোরাজানের ভিতর ইহাই পার্থক্য। সোরাজান দহনকার্যের সহায়কও নহে এবং নিজেও দাহ্য পদার্থ নহে। থিতান পরিষ্কার চুনের জল সোরাজানের সংস্পর্শে আসিলে ঘোলা হয় না।

বায়ুতে সামান্য পরিমাণ অঙ্গারাম্ল আছে। এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস বর্ণহীন ও সামান্য গন্ধযুক্ত। ইহার স্বাদ আছে এবং জলে কিছু পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। ইহা নিজে জ্বলে না; কোন জ্বলন্ত শিখা ইহার ভিতর ডুবাইলে নিবিয়া যায়। বায়ু অপেক্ষা অঙ্গারাম্ল প্রায় দেড়গুণ ভারী। পরিষ্কার চুনের জলের ভিতর অঙ্গারাম্ল গ্যাস মিশাইলে চুনের জল খড়ি-গোলা জলের মত সাদা হইয়া যাইবে। মোমবাতির শিখার উপর অঙ্গারাম্ল গ্যাসের জার কাত করিয়া ধরিলে বাতি তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যাইবে।
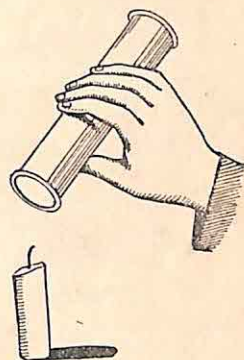
অঙ্গারাম্ল গ্যাসে প্রজ্বলিত মোমবাতি নিবিয়া যায়

বায়ুতে কিছু জলীয় বাষ্প আছে। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শীতল হইলে জমিয়া তুষার, শিশির, মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া থাকে।

জলের মুল উপাদানের ধর্ম: জল একটি যৌগিক পদার্থ। অম্লজান এবং উদজান নামক দুইটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে ইহা উৎপন্ন। জলের উপাদান উদজান এবং অম্লজান ইহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে জলে আয়তনের দুই ভাগ উদজান ও এক

ভাগ অম্লজান গ্যাস আছে। এই দুই গ্যাসের নিজস্ব কোন গুণ বা ধর্ম জলে বর্তমান থাকে না। অম্লজানের ধর্ম তোমাদের জানা আছে। জলের অপর উপাদান উদজান একটি **স্বাদহীন, গন্ধহীন** ও **বর্ণহীন** পদার্থ। জলে ইহা সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা লঘু এবং লঘু বলিয়া বেলুন উদজান গ্যাসে পূর্ণ করিলে আকাশে উড়িয়া যায়। বায়ুতে এই গ্যাস জ্বলে এবং বায়ুর অম্লজান এই দহনের সাহায্য করে। দহনের সময় উদজান ও অম্লজান মিলিত হইয়া জল সৃষ্টি করে। বায়ুতে এই গ্যাস জ্বলিবার সময় তাপ উৎপন্ন হয়। উদজানপূর্ণ গ্যাসজারের ভেতর একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে কাঠিটি নিবিয়া যাইবে, কিন্তু পাত্রে সামান্য পরিমাণ বায়ু থাকিলেও তাহার সাহায্যে উদজান নিজে জ্বলিয়া উঠিবে।
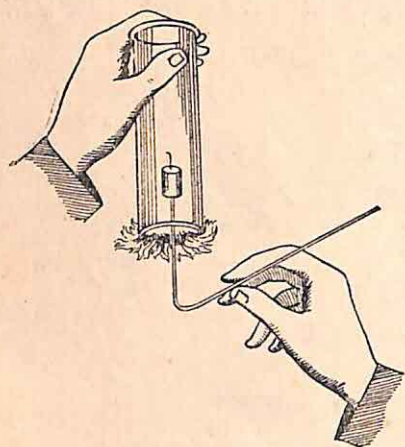
কাঠিটি নিবিয়া যায় ও গ্যাস জ্বলিয়া উঠে

জলের দ্রাব্যতা

দ্রাবক ঃ এক টুকরা মিছরি জলে ফেলিয়া দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উহা জলে গলিয়া যায়। মিছরির টুকরা জলে গলিয়া এমনভাবে মিলিয়া যায় যে উহার এক ফোঁটা জল মুখে দিলেও

তাহা মিষ্ট লাগে। এইরকম চিনি, লবণ, তুঁতে, ফটকিরি প্রভৃতি পদার্থও ধীরে ধীরে জলে গলিয়া জলের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। মিছরির শরবত, চিনির শরবত, লবণজল, ফটকিরির জল বা তুঁতের জল প্রভৃতি জলকে **দ্রবণ** বলা হয়; যে বস্তুগুলি জলে গলে তাহাদিগকে **দ্রাব্য পদার্থ** বলা হয়। দ্রাব্য পদার্থগুলি যাহাতে গলে তাহাকে **দ্রাবক** বলে। মিছরির শরবত একটি **দ্রবণ**; মিছরি একটি **দ্রাব্য পদার্থ** এবং জল **দ্রাবক**।

জল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রাবকঃ জল ছাড়া অন্যান্য তরল পদার্থে যত বস্তু দ্রবীভূত হইতে পারে, জলে তাহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পদার্থ দ্রবীভূত হয়। এই জন্যই জল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রাবক। নানা পদার্থ জলে সহজে দ্রবীভূত হয় বলিয়া প্রকৃতি হইতে কোন সময়েই বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না। ইহাতে কোন-না কোন পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় মিশিয়া থাকে। জলের ভিতর অঙ্গারাম্ল গ্যাস থাকিলে ইহার দ্রাব্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। জলে নানাবিধ কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহা ছাড়া নানা প্রকার গ্যাস এবং বায়ুও সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় জলে থাকে। মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িবার সময় বৃষ্টির জল অম্লজান ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস দ্রবীভূত করে। সোডাওয়াটার অঙ্গারাম্ল গ্যাসের দ্রবণ।

কিছু খড়ির গুঁড়া, গন্ধকচূর্ণ, বালি বা কাঠকয়লার গুঁড়া জলে দিয়া নাড়িলে ইহারা যেমন তেমনই থাকে, জলে দ্রবীভূত হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে কতকগুলি পদার্থ জলে গলে না। ইহারা জলের পক্ষে **অদ্রাব্য পদার্থ**।

জলের দ্রাব্যতার একটা সীমা আছে। এক গ্লাস জলে কিছু মিছরি দিয়া নাড়িতে থাকিলে মিছরিটুকু দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।

সেই জলে আরও খানিকটা মিছরি দিলে, তাহাও হয়তো গলিয়া যাইবে ; ইহার পর আরও খানিকটা মিছরি দিলে, হয়তো তাহা আর গলিবে না, জলের তলায় পড়িয়া থাকিবে। জল নাড়িলেও উহা আর দ্রবীভূত হইতে চাহিবে না। এখানে বুঝা যাইতেছে জল মিছরি দ্রবীভূত করিবার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। মিছরির এই অসম্পূর্ণ দ্রবণটি যদি আগুণের উত্তাপে ফুটান যায় তবে সেই মিছরির টুকরাটিও গলিয়া যাইবে। এমন কি আরও কিছু মিছরি দিলে উত্তাপে গলিতে পারে। আবার ঐ গরম মিছরির দ্রবণটি ঠাণ্ডা করিলে দেখা যায়, দ্রবীভূত মিছরির কতক অংশ দ্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া তলায় থিতাইয়া পড়ে। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল নির্দিষ্ট তাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাব্য গলাইতে পারে। উত্তাপ বাড়াইলে জলের দ্রাব্যতা বাড়ে ও উত্তাপ কমাইলে ঐ শক্তিও কমে।

আর্দ্রতা, বৃষ্টি (জলচক্র), মেঘ, কুয়াশা, শিশির, তুষার

আর্দ্রতাঃ খাল-বিল, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর প্রভৃতি জলাশয়ের জল ক্রমাগত সূর্যতাপে বাষ্প হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিতেছে। এই বাষ্পই জলীয় বাষ্প। বায়ুতে যে পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে তাহাই বায়ুর আর্দ্রতা। গ্রীষ্মকালে বায়ু শুষ্ক থাকে ; এইজন্য গরমের দিনে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। আবার বর্ষাকালে বায়ুতে খুব বেশী মাত্রায়

জলীয় বাষ্প থাকে ; এইজন্য ভিজা কাপড় শুকাইতে খুব সময় লাগে। বায়ুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প মিশিয়া থাকিতে পারে, উহার বেশী পারে না। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত কম থাকে, ততই ভিজা জিনিস বা জল হইতে দ্রুত জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়। বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুর আর্দ্রতা বিভিন্ন প্রকার থাকে। সকল সময়ে বায়ু সমভাবে শুষ্ক কিংবা আর্দ্র থাকে না।

বৃষ্টি (জলচক্র) ও মেঘঃ গরম জলে যেমন বেশী মিছরি দ্রবীভূত হয় ও দ্রবণ শীতল হইলে যেমন কতক মিছরি আবার দ্রবণ হইতে বাহির হইয়া দৃশ্যমান হয়, বায়ু গরম হইলেও তেমনই বায়ুতে বেশী জলীয় বাষ্প ধরে ও আবার বায়ু শীতল হইলে কতক জলীয় বাষ্প বায়ু হইতে বাহির হইয়া দৃশ্যমান হয়। সাগর উপসাগর হইতে নিয়ত জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশিতেছে। ঐ বায়ু উপরে
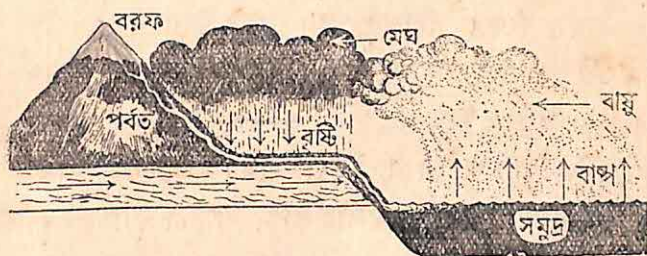
জলচক্র

উঠিয়া শীতল হয়। শীতল বায়ু অধিক বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না ; কতক বাষ্প বায়ু হইতে পৃথক হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যমান জলকণায় পরিণত হয়। ঊর্ধ্বাকাশের এই সকল জলকণাসমষ্টিই মেঘ। আকাশে বেশী মেঘ জমিলে বাতাসের চাপে মেঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি মিলিত হইয়া থাকে। এইরূপে মিলিত হইয়া জলের ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র কণাগুলি বড় ও ভারী হইলে আর আকাশে ভাসিয়া থাকিতে পারে না। তখন উহারা বৃষ্টি রূপে ঝরিয়া পড়ে। উর্ধ্ব আকাশের সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ **তুষার** রূপে পর্বতের উর্ধ্বদেশে সঞ্চিত হয়। প্রচুর তুষার জমিলে উপরের চাপে উহা পর্বতের পার্শ্বদেশ বাহিয়া নীচের দিকে নামে ও গলিয়া জল হইয়া নদীর সৃষ্টি করে। সেই নদীই আবার মাটির উপর দিয়া আসিয়া সাগরে মিশে। সাগর হইতে আবার নিয়ত বাষ্প উঠিয়া মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি করিতেছে। বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া বা মৃত্তিকার নিম্নভাগ দিয়া আবার সাগরে যাইতেছে। এইরূপে ক্রমাগত প্রকৃতির **জলচক্রের** আবর্তন চলিতেছে।

শিশির ও কুয়াশা ঃ শরৎকালের শেষের দিকে হেমন্ত ও শীতকালের প্রভাতে ঘাস ও লতাপাতার উপর মুক্তাবিন্দুর মত শিশির ঝলমল করে। দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ উত্তপ্ত হয় এবং সূর্য অস্তমিত হইলে এই সকল পদার্থ তাপ ছাড়িয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইতে থাকে। এইভাবে শীতের রাত্রে মাটি, ঘাস, গাছ, লতাপাতা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এদিকে মাটির ঠিক উপরের বায়ু যখন পূর্বের সব জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না তখন ঘাস ও লতাপাতার গায়ে জলীয় বাষ্প লাগিয়া জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণাগুলিকেই **শিশির** বলে।

উনানের উপর কেটলির জল যখন ফুটিতে থাকে তখন কেটলির নলের মুখের একটু দূরে সাদা ধোঁয়ার মত যে জিনিস দেখা যায় তাহা বাষ্প নহে। কারণ বাষ্প বায়ুর মতই অদৃশ্য। কেটলি হইতে নির্গত বাষ্প ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া ঘনীভূত হইয়া ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হইয়াছে। সেই জলকণাগুলিকেই

সাদা ধোঁয়ার মত দেখাইতেছে। ইহারই নাম **কুয়াশা**। বাষ্প ঘনীভূত হইলেই কুয়াশার সৃষ্টি হয়। তাই গরম ভাতের উপর, চায়ের পেয়ালার উপর, কিংবা শীতকালে হাই তুলিলে এই কুয়াশাই আমরা দেখিয়া থাকি। শীতকালে সকালে ও বৈকালে বাষ্প ঘনীভূত হইয়া প্রচণ্ড কুয়াশার সৃষ্টি করে; আবার রৌদ্র উঠিলে কুয়াশা বাষ্প হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়।

তুষারঃ পর্বতের উর্ধ্বদেশে আকাশের জলীয় বাষ্প জমিয়া **তুষার** বা বরফে পরিণত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা শীতপ্রধান দেশে শীতকালে বায়ুর জলীয় বাষ্প শৈত্যে জমিয়া তুষারকণার সৃষ্টি করে। শীতের প্রচণ্ডতা যত বেশী হয় তুষারপাতের পরিমাণও তত বেশী হইতে থাকে। পেঁজা তুলার মত ক্রমাগত তুষারপাত হইয়া পথ-ঘাট একেবারে সাদা হইয়া থাকে। বায়ুর জলীয় বাষ্পই শৈত্যে জমিয়া তুষারকণার সৃষ্টি করে।

খরজল ও মৃদুজল

খরজলঃ জলে সাবান ঘষিলে ফেনা হয়; কিন্তু সকল জলে ভাল ফেনা হয় না। কোন কোন কুয়ার জল বা ঝরনার জলে সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় না। যে জলে সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় না, তাহাকে **খরজল** বা **কঠিন জল** (Hard Water) বলে।

মৃদুজলঃ যে জলে সহজে সাবানের ফেনা হয়, তাহাকে **মৃদুজল** বা **কোমল জল** (Soft Water) বলে।

খরজল ও মৃদুজলের রাসায়নিক কারণঃ বৃষ্টির জলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস থাকে বলিয়া মার্বেল ও খড়িমাটি ঐ জলে দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত অবস্থায় মার্বেল বা খড়িমাটি ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট

নামক লবণে পরিবর্তিত হয়। অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সাহায্যে অদ্রাব্য ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট নামক পদার্থও জলে দ্রবীভূত হইয়া ম্যাগ-নেসিয়াম বাই-কার্বনেট রূপে জলে গলিয়া যায়। এই সকল পদার্থ ছাড়া চুন ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত নানারূপ লবণ কূপ-তড়াগাদির জলে দ্রবীভূত থাকে। জলে সাবান ঘষিলে যদি ফেনা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, এই সকল পদার্থ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত পদার্থগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সাবানের সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার অদ্রাব্য পদার্থ উৎপন্ন করে। তাহাতে জলের মধ্যে সাবান থাকিতে পায় না; জল হইতে পৃথক হইয়া যায়; সেইজন্য খরজলে ফেনা হইতে পারে না। মৃদুজলে এই সকল লবণ থাকে না।

খরজলকে মৃদু করিবার প্রণালীঃ খরজল ফুটাইলে তাহার অন্তর্গত ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিবর্তিত হইয়া জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে এবং খরজল মৃদুজলে পরিণত হয়। যে জল ফুটাইলে সহজেই মৃদুজলে পরিণত হয় সে জলকে **অস্থায়ী খরজল** বলে। কিন্তু যে খরজল ফুটাইলে মৃদুজলে পরিণত হয় না, তাহাকে **স্থায়ী খরজল** বলে। স্থায়ী খরজলকে মৃদু করিতে হইলে জলের সহিত কিছু সোডা মিশাইতে হয়। সোডার সহিত জলে দ্রবীভূত লবণগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঐগুলি অদ্রাব্য কঠিন পদার্থরূপে তলায় সঞ্চিত হয় এবং জলের কাঠিন্য বা খরত্ব নষ্ট হয়।

বস্ত্রাদি সাবান দিয়া পরিষ্কার করিতে যেমন মৃদুজল দরকার, পান ও রন্ধনের জন্যও সেইরূপ মৃদুজল ব্যবহার করাই উচিত। খরজলে দ্রবীভূত লবণগুলি শরীরে নানারূপ রোগের সৃষ্টি করিতে পারে।

শক্তির উৎস—জলচালিত যন্ত্র ও বাঁধ

জলচালিত যন্ত্রঃ তোমরা জান জল সকল সময়েই নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। ঝরনা, নদী ইত্যাদির জল স্রোতের সৃষ্টি করিয়া দ্রুতবেগে বহিয়া চলে। এই জলের স্রোতে গতিশক্তি আছে। এই গতিশক্তি হইতে নানা শক্তি উৎপন্ন করিয়া আজকাল নানা কাজে লাগান হইতেছে। কিন্তু নদীর সাধারণ স্রোতের বেগ পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র বিশেষ কার্যকরী হয় না। তজ্জন্য স্রোতঃশক্তি অধিক পরিমাণে পাইতে হইলে বাঁধ দিয়া নদীর জল রুদ্ধ করিয়া উচ্চ গভীর জলাশয় নির্মাণ করিতে হয়। এই সকল জলাশয়ের জল নীচের দিকে প্রবল চাপ দিতে পারে। এই জলের প্রবল ধারা ফলকবিশিষ্ট চাকায় চাপ দিয়া উহাকে ঘুরায়; তাহাতে চাকার অক্ষদণ্ডটিও ঘুরে। খাঁজবিশিষ্ট স্ক্রু ও দাঁতযুক্ত চাকার সাহায্যে সেই গতিশক্তিকে সুবিধামত স্থানান্তরে চালিত করিয়া নানা কলে ব্যবহার করা হয়। জলশক্তি হইতে আজকাল সর্বত্র ব্যাপক-ভাবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হইতেছে।

১ম—জল তলদেশে চাপ দিয়া চাকা ঘুরায়

জলশক্তি দ্বারা তিন প্রকারের চাকা ঘুরান হয়। প্রথম ব্যবস্থায় বাঁধের মধ্যবর্তী **স্লুইস** দ্বার নামক ছিদ্রপথে জল বাহির করা হয়। ঐ জল চাকার তলদেশের ফলকগুলিতে চাপ দিয়া চাকা ঘুরায়।
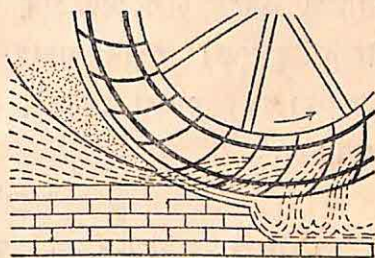
দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, বাঁধের উপর হইতে চাকার ফলকের উপর জল ফেলা হয়। ইহাতে পড়ন্ত জলের চাপে চাকা ঘুরে।
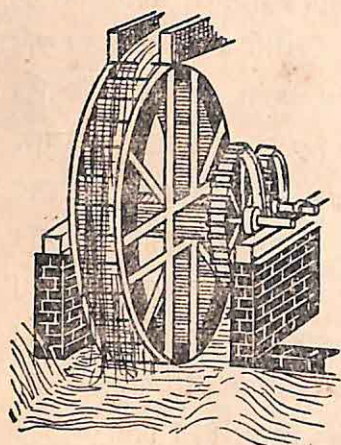
২য়—পড়ন্ত জলের চাপে চাকা ঘুরে
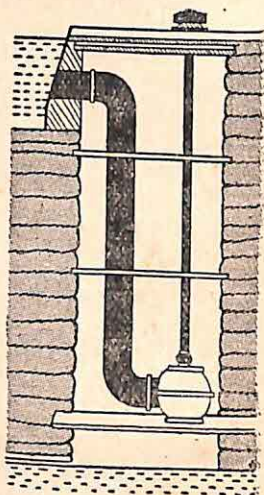
৩য়—ওয়াটার টারবাইন

তৃতীয় ব্যবস্থায়, বাঁধের উপর হইতে নলপথে ভীষণ বেগে নামিয়া ফলকে চাপ দিয়া চাকা ঘুরায়। এই ব্যবস্থাকে ওয়াটার টারবাইন বলে। ইহার দ্বারাই সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক ডায়নামো চালানো হয়। সকল ক্ষেত্রেই, চাকার অক্ষদণ্ড হইতে শক্তি সঞ্চয় করা হয়।

অনুশীলনী

১। বিশুদ্ধ জল কাহাকে বলে? জল কি কি উপায়ে বিশোধিত করা হয়?
২। 'বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ'—প্রমাণ দিয়া ব্যাখা কর।
৩। সাধারণ মিশ্রণ ও রাসায়নিক সংযোগের পার্থক্য কি বুঝাও।
৪। খরজল কাহাকে বলে? খরজলকে কি করিয়া মৃদু করা যায়?
৫। জলশক্তি দ্বারা কিরূপে চাকা ঘুরান হয়, বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

শক্তি

শক্তি ঃ কাজ করিবার ক্ষমতার নামই শক্তি। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি তাহা পদার্থ ও শক্তি। পদার্থ মাত্রেরই আয়তন ও ওজন আছে; শক্তির তাহা নাই। শক্তি পদার্থের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহার গতি বা অবস্থান্তর ঘটাইয়া থাকে। গতিশীল বস্তু মাত্রেরই কাজ করিবার শক্তি থাকে। এই গতিমূলক শক্তির নাম **গতিশক্তি** (Kinetic Energy)। বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন উহা গতিশক্তি লাভ করে। বাতাস গতিশক্তির সাহায্যে নৌকার পালে চাপ দেয় বলিয়াই নৌকা জলের বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে। পদার্থ গতিশূন্য অবস্থায় থাকিলেও উহার মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে। এই শক্তির নাম **স্থৈতিক শক্তি** (Potential Energy)। ঘড়িতে যখন দম দেওয়া হয় তখন আমাদের মাংসপেশীর শক্তি ঘড়ির স্প্রীং-এর মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে অবস্থান করে। উহা ঘড়ির চাকাগুলিকে ঘুরাইবার সময় গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এইরূপে এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

শক্তির প্রকার-ভেদ ঃ শক্তি নানা প্রকার।

(১) **যান্ত্রিক শক্তি** (Mechanical Energy) :—গতিশক্তি ও স্থৈতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি বলা হয়।

(২) **তাপশক্তি** ঃ—কয়লা পুড়িলে যে উত্তাপ হয়, সেই উত্তাপ হইতে বাষ্প উৎপন্ন হইয়া এঞ্জিন চালাইতে পারে। সুতরাং তাপ এক প্রকার শক্তি।

(৩) **আলোকশক্তি** ঃ-আলোকের সাহায্যে আমরা দেখি, আলোক গাছের পাতা সবুজ করে ও ফটোগ্রাফির কাচের উপর আলোছায়ার রেখাপাত করে। সুতরাং আলোক আর এক প্রকার শক্তি।

(৪) **শব্দশক্তি** ঃ—শব্দ কানের পর্দায় আঘাত করে। মেঘ-গর্জনের শব্দে অনেক সময় ঘর-বাড়ী কাঁপিয়া উঠে। ইহাতে বুঝা যায় শব্দ এক প্রকার শক্তি।

(৫) **তড়িৎশক্তি** ঃ—তড়িতের সাহায্যে আলোক জ্বলে, পাখা ঘুরে ; সুতরাং তড়িৎও শক্তি।

(৬) **চুম্বকশক্তি** ঃ—চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে। চুম্বক এক প্রকার শক্তি।

(৭) **রাসায়নিক শক্তি** ঃ—কয়লা, কেরোসিন, বাতি ইত্যাদির মধ্যে রাসায়নিক শক্তি আছে। এই সকল পদার্থের উপাদানের সহিত বাতাসের অম্লজান গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে আলোক, উত্তাপ ও তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক ক্রিয়াও শক্তির আর একটি বিকাশ।

শক্তির রূপান্তর ঃ শক্তির ক্ষয় বা লোপ নাই, কেবলমাত্র রূপান্তর আছে। একই শক্তি নানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। কয়লা পোড়াইলে তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। ঐ তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়, বাষ্প এঞ্জিনের চাকা ঘুরায় ; চাকা ঘোরে বলিয়া রেল-গাড়ি চলে। কয়লার তাপশক্তি গাড়ির গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আমরা শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পারি না, কেবল রূপান্তরিত করিতে পারি। ইহা নষ্ট বা সৃষ্টি করা যায় না।

শক্তির উৎস

এই পৃথিবীতে আমরা নানাভাবে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। তাপশক্তি বা রাসায়নিক শক্তি এই সকল বিকাশের মূল। কাঠ-কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি বস্তুর রাসায়নিক দহন হইতে তাপের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেহের মধ্যে খাদ্যের রূপান্তর ঘটিতেছে। তাহাতে দেহে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের ভক্ষ্য উদ্ভিজ্জ পদার্থসমূহে সূর্যকিরণ দ্বারা সম্পাদিত নানা রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন হইতেছে। কয়লা ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ উদ্ভিদেরই রূপান্তর। সূর্যের তেজেই কাঠ, কয়লা ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্যের শক্তি ঐ সকল বস্তুতে বহুকাল হইতে সঞ্চিত আছে। সুতরাং সূর্যের শক্তি বা **সৌরশক্তিই প্রায় সমস্ত পার্থিব শক্তির মূল**।

সৌরশক্তিই বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের কারণ। সূর্যের আলোকে ও উত্তাপে উদ্ভিদ জন্মে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া নূতন বীজের সৃষ্টি করে। উদ্ভিদ ও জীবজগতের সজীবতার মূলেও এই সৌরশক্তি বর্তমান। বৃক্ষলতাপাতায় ও শস্যশস্পে সূর্যের শক্তি সঞ্চিত হইতেছে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে জীবগণ আবার সেই শক্তি নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেছে। খাদ্য হইতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী শক্তি সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং **খাদ্যও** এক প্রকার **শক্তির উৎস**। খাদ্য দেহকে সবল ও সুস্থ রাখে। খাদ্যাভাব ঘটিলে জীব দুর্বল হইয়া কর্মশক্তি হারায়। জীবের কর্মশক্তির উৎস এই খাদ্যের মূলেও সূর্যের শক্তিই কাজ করিতেছে।

যন্ত্র ও দেহযন্ত্র ঃ যে-কোন যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের দেহ-যন্ত্রের তুলনা করা চলে। যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে যেমন যন্ত্র চলে তেমনই একপ্রকার শক্তির সাহায্যেই দেহযন্ত্র চলিয়া থাকে। ঘড়ির ভিতরে নানা রকমের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি একযোগে কাজ করিয়া চলিয়াছে। ঘড়িতে দম দিয়া উহাতে শক্তি সঞ্চারিত করিতে হয়। সমস্ত যন্ত্র ঠিকভাবে থাকা সত্ত্বেও ঘড়িতে দম না দিলে ঘড়ি চলে না। মানব-দেহও ঘড়ির মতই একটি বিরাট যন্ত্র-বিশেষ। দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহের ভিতরের নানা অংশ যন্ত্রের মতই নিজের নিজের কাজ করিয়া চলে বলিয়াই দেহ সুস্থ থাকে। ঘড়িতে দম দিয়া যেমন শক্তি সঞ্চারিত করিতে হয় তেমনি দেহযন্ত্রকে সবল ও সচল রাখিবার জন্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহে শক্তি সঞ্চারিত করিতে হয়।

কয়লা যেমন উত্তাপ সৃষ্টি করে, ঠিক সেইরূপে খাদ্য দেহের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় ও তাহার ফলে দেহে তাপের সৃষ্টি হয় এবং দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করে এবং কার্যক্ষমতা যোগাইয়া জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করে।

তাপশক্তি

তাপ ঃ তাপ বা উত্তাপ শক্তির একটি রূপ। পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই কিছু-না কিছু তাপ আছে। পদার্থের মধ্যে তাপ থাকিলে তাহা উষ্ণ হয়। আমাদের দেহে তাপ আছে বলিয়া আমাদের দেহ উষ্ণ। যে পদার্থের উষ্ণতা আমাদের দেহের উষ্ণতা অপেক্ষাও অধিক, তাহা স্পর্শ করিলে আমরা গরম বোধ করি ও ঐ পদার্থকে উষ্ণ বলি। কিন্তু যে পদার্থের উষ্ণতা আমাদের দেহের

উষ্ণতা অপেক্ষা কম, তাহা স্পর্শ করিলে আমাদের শীতল বোধ হয় এবং ঐ পদার্থকে আমরা শীতল বলিয়া থাকি। সুতরাং উষ্ণ ও শীতল উভয় পদার্থের মধ্যেই অল্পাধিক তাপ বর্তমান।

তাপের উৎস : পৃথিবীর সকল প্রকার **তাপের উৎস সূর্য।** সূর্য হইতে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমস্ত তাপ সংগ্রহ করি। **দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া** এবং **বিদ্যুৎ ও ঘর্ষণাদি যান্ত্রিক ক্রিয়া** হইতে সাধারণতঃ তাপ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

(১) **সূর্য :**—তাপের মূল উৎস সূর্য। সূর্য একটি প্রকাণ্ড অগ্নিময় গোলক। সূর্য হইতে অসীম তেজ বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্য হইতে বহু দূরে থাকিয়া সূর্যোত্তাপের অতি সামান্য অংশ পাইতেছে। সেই তাপের ফলেই পৃথিবীতে ঋতুপরিবর্তন, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নানা ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সূর্যের উত্তাপ না পাইলে পৃথিবীর তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ জমিয়া কঠিন হইয়া যাইত। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মিতে পারিত না। কয়লা, কাঠ, কেরোসিন প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের তাপও সূর্যের তাপশক্তি হইতেই সঞ্চিত হইয়াছে। এই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের তাপই সূর্যের তাপ হইতে সংগৃহীত। সুতরাং সূর্যই তাপের **মূল উৎস।**

(২) **তড়িৎ :**—তড়িৎশক্তি ডায়নামো নামক যন্ত্র হইতে পাওয়া যায়। এই তড়িৎশক্তি একটি উত্তাপের উৎস। তড়িতের সাহায্যে আলো জ্বলে ; তড়িৎ-চুল্লীতে রন্ধনাদি কার্য হইয়া থাকে। তোমরা ইলেকট্রিক আলো, ইলেকট্রিক ইস্তিরি ও ইলেকট্রিক স্টোভ নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সব যন্ত্রগুলি তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং তড়িৎশক্তিও তাপের উৎস।

(৩) **যান্ত্রিক শক্তি ঃ**—আমরা যদি দুই হাত ঘর্ষণ করি, তাহা হইলে আমাদের হাত গরম বোধ হয়। ঘর্ষণে আমাদের দেহের শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া হাত দুটি গরম করে। এইরূপে যান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন শক্তি হইতেও তাপ পাওয়া যায়। সুতরাং যান্ত্রিক শক্তিও তাপের একটি উৎস।

(৪) **রাসায়নিক তাপশক্তি ঃ**—মোমবাতি একটি যৌগিক পদার্থ। ইহা অঙ্গার ও উদজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন। মোমবাতি যখন জ্বলে, তখন মোম গলিয়া তেলের মত তরল হয় এবং সলিতার সাহায্যে দগ্ধ হইয়া থাকে। মোমবাতির অঙ্গার ও উদজান বায়ুর অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয়বাষ্পে পরিণত হয় এবং উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন করে। অঙ্গার ও অম্লজানের দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই উত্তাপের সৃষ্টি হয়। মোমবাতি, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি আছে তাহাই অগ্নিসংস্পর্শে মুক্ত হয় এবং তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং রাসায়নিক শক্তিও তাপশক্তির একটি উৎস।

তাপের ক্রিয়া

জড় পদার্থ ও তাপ ঃ—বিভিন্ন পদার্থের উপর তাপশক্তি বিভিন্ন ভাবে কাজ করিতেছে। জড় পদার্থের উপর তাপের নানা প্রকার প্রভাব দেখা যায়, যথা—

(১) তাপে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

(২) তাপে পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে।

(৩) তাপে পদার্থের অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে।

(৪) তাপে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

কঠিন বস্তুর উপর তাপের ক্রিয়াঃ—কঠিন বস্তুর উপর তাপ প্রয়োগ করিলে সাধারণতঃ তিনটি প্রভাব দেখা যায়। প্রথমতঃ, তাপের ক্রিয়ায় কঠিন পদার্থগুলি গরম হয় বা উহাদের উষ্ণতা বাড়ে। সূর্যের উত্তাপে মাটি ও বালি কিরকম গরম হয় তাহা তোমরা সকলেই জান। দ্বিতীয়তঃ, তাপ দিলে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। কঠিন বরফে তাপ দিলে উহা গলিয়া জল হইয়া যায়, ইহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুও উত্তাপে গলিয়া তরল হয়। তৃতীয়তঃ, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের আয়তন বাড়ে।

তাপের দীপ্তিঃ কাঠ, কয়লা, বাতি ও নানা রকমের ধাতু উত্তপ্ত হইলে উহাদের গাত্রবর্ণের পরিবর্তন ঘটে। কঠিন পদার্থকে উত্তপ্ত করিতে থাকিলে উহা প্রথমতঃ লাল ও পরে সাদা হইয়া থাকে। কয়লার উনান যখন ধরান হয়, তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে কয়লা উত্তপ্ত হইলে প্রথমতঃ লাল ও পরে সাদা হইয়া উঠে এবং আলোক বিকিরণ করে। যে সকল পদার্থ তাপপ্রয়োগে সহজে গলে না, তাহারা নিরন্তর তাপপ্রয়োগের ফলে লাল হইয়া উঠে এবং আলোক বিকিরণ করে।

তাপের দহনঃ একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠকে অগ্নিশিখায় ধরিলে উহা জ্বলিয়া উঠে। কাষ্ঠ একটি যৌগিক পদার্থ। অগ্নিসংযোগে ইহার উপাদানগুলির সহিত বায়ুর অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ হয় এবং তাহাতে সম্পূর্ণ নূতন কয়েকটি পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাপে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন হয় বলিয়াই অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে। তাপের প্রভাবে দাহ্য পদার্থের প্রজ্বলনের সহিত দহনক্রিয়া সংঘটিত হয়।

তাপে অবস্থার পরিবর্তন: তাপ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। আমরা জানি, একই পদার্থ অবস্থা-ভেদে তিন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। বরফ, জল ও বাষ্প জলেরই কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা। কিছুক্ষণ বায়ুতে রাখিয়া দিলে বরফ বায়ুর উত্তাপে গলিয়া জলে পরিণত হয়। আবার উত্তাপ দিয়া ফুটাইতে থাকিলে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে।

মোমবাতির মোম সাধারণ অবস্থায় কঠিন কিন্তু মোমবাতি জ্বালাইলে উহা তাপে গলিতে থাকে। ধান উত্তপ্ত করিলে খই হয়। চাউল জলে উত্তপ্ত করিলে ভাত হয়। তাপপ্রয়োগের ফলে ধানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া উহা আর ধান থাকে না, রূপান্তরিত হইয়া খই হইয়া যায়। চাউল জলে সিদ্ধ করিলে অর্থাৎ তাপে ফুটাইলে উহারও পরিবর্তন হয়। এইভাবে তাপযোগে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে।

তাপে আয়তনের পরিবর্তন: তাপে আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থের আয়তন বাড়ে ও শীতল হইলে আয়তন কমে। আমাদের চারিদিকে অনবরত পদার্থের আয়তনের প্রসারণ ও সংকোচন হইতেছে। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। তোমরা জান, সূর্যের উত্তাপে বায়ু প্রসারিত হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং আয়তনে বৃদ্ধি পায় বলিয়াই লঘু হইয়া উপরে উঠে। পদার্থ মাত্রই তাপে প্রসারিত হয় ও শৈত্যে সংকুচিত হয়।

কঠিন পদার্থের আয়তন যে তাপে বাড়ে তাহা সহজেই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা ঃ—একই মাপের একটি পিতলের আংটা ও একটি গোলক পাওয়া যায়। উহাদের মাপ এমন যে সাধারণ অবস্থায় গোলকটি আংটার ভিতর দিয়া সহজে গলিয়া যায়। ফুটন্ত জলে ফেলিয়া গোলকটিকে গরম করিয়া আংটায় বসাও। দেখ গোলকটি আংটার ভিতর দিয়া আর গলিতেছে না। গোলকটিকে আংটার উপর রাখিয়া দিলে, কিছুক্ষণের মধ্যে উহা তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল ও সংকুচিত হইবে এবং তখন আপনা হইতেই আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া পড়িবে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়ে এবং শীতল হইলে আয়তনে কমিয়া যায়। উত্তপ্ত হইয়া গোলকটির আয়তন বাড়িয়াছিল। সেইজন্য উহা তখন আর আংটার ভিতর দিয়া গলিতে পারে নাই। পরে যখন শীতল হইয়া সংকুচিত হইল, তখন আংটার ভিতর দিয়া গলিয়া গেল।

তাপ দেওয়ার পরে — তাপ দেওয়ার আগে

গরুর গাড়ির চাকায় যে লোহার বেড় থাকে, উহার আয়তন চাকার আয়তন অপেক্ষা সামান্য কম থাকে। বেড় লাগাইবার
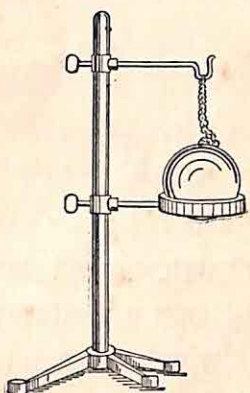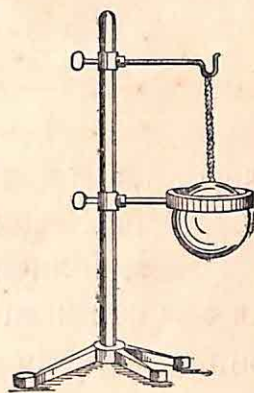
সময় তাপ দিয়া উহাকে খুব গরম করিতে হয়। উহাতে বেড়ের আয়তন বাড়েও সহজে চাকাটিকে বেড়ের ভিতরে প্রবেশ করান
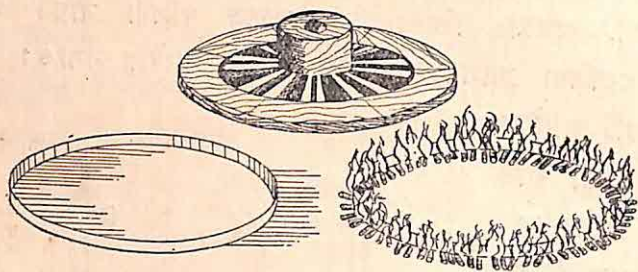
চাকার বেড় লাগান

যায়। পরে ঠাণ্ডা হইলে বেড়ের আয়তন কমিয়া যায় ও উহা চাকাখানিকে শক্তভাবে ধরিয়া থাকে।

তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধিঃ কেবল যে কঠিন পদার্থের আয়তন তাপে বৃদ্ধি পায় তাহা নহে। তরল ও গ্যাসীয় পদার্থও তাপ পাইলে আয়তনে বাড়ে।

(১) **তরল পদার্থের পরীক্ষা** :—একটি সরুগলা কাচের ফ্লাস্ক গলার কিছুদূর পর্যন্ত রঙিন জলে পূর্ণ কর। এখন ফ্লাস্কটিকে খাড়া ভাবে গরম জলে বসাও। দেখিবে ভিতরের জল নীচের দিকে একটুখানি নামিয়া গেল। কাচের ফ্লাস্ক গরম হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইজন্য জল নীচে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কিছু পরেই দেখিবে ভিতরের জল উপরের দিকে উঠিতেছে। উত্তাপে তরল পদার্থ কঠিন পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়ে। কাচ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফ্লাস্কের আয়তন যতখানি বর্ধিত হইল,
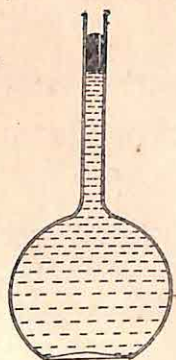
তরল পদার্থের পরীক্ষা

জলের আয়তন তাহা অপেক্ষা অধিক বর্ধিত হইল। সেইজন্য জল ক্রমে ক্রমে প্রথমে যে স্থানে ছিল, সে স্থান ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিয়া গেল। এই অবস্থায় ফ্লাস্কটিকে শীতল জলে বসাও; দেখিবে জল ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কঠিন পদার্থের মত তরল পদার্থও তাপ দিলে প্রসারিত হয় এবং শীতল হইলে সংকুচিত হইয়া থাকে।

(২) **গ্যাসীয় পদার্থের পরীক্ষা**ঃ—তাপে গ্যাসীয় পদার্থেরও উষ্ণতা বাড়ে এবং কঠিন ও তরল পদার্থ অপেক্ষা উহা অনেক বেশী প্রসারিত হয়। একটি কাচের ফ্লাস্কের মুখ রবারের ছিপি দিয়া বন্ধ করা আছে। সেই ছিপিটির ছিদ্র দিয়া একটি সরু কাচের নল পাত্রটির ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। কাচের নলের ভিতরে এক ফোঁটা লাল কালি রহিয়াছে। এবার ফ্লাস্কটিকে সামান্য উত্তাপের মধ্যে রাখ। দেখিবে লাল কালির ফোঁটাটি দ্রুতবেগে সরু নলের উপরের দিকে উঠিতেছে। তাপ বন্ধ কর। ফ্লাস্কটি ঠাণ্ডা হইলে দেখিবে, কালির ফোঁটাটি আবার নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। তাপপ্রয়োগে কাচের ভিতরের বায়ু প্রসারিত হইয়া ফোঁটাটিকে উপরের দিকে সরাইয়া বেশী আয়তন অধিকার করিল; আবার তাপ বন্ধ করায় বায়ু সংকুচিত হওয়ায় আয়তন কমিয়া গেল। সেজন্য ফোঁটাটি নীচের দিকে নামিয়া আসিল।

গ্যাসীয় পদার্থের পরীক্ষা

তবেই দেখা যাইতেছে, তাপে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বাড়ে।

তাপমান যন্ত্র

তাপ ও উষ্ণতা:—তাপ ও উষ্ণতা এক নহে। তাপ এক প্রকার শক্তি এবং উষ্ণতা তাহার প্রকাশ। কোন পদার্থের মধ্যে তাপশক্তি প্রবেশ করিলে, তাহা উষ্ণ হয়। উষ্ণতা প্রধানতঃ তাপের পরিমাণ ও পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সমপরিমাণ তাপ দিলে এক বালতি জল যতখানি উষ্ণ হইবে, এক বাটি জল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উষ্ণ হইবে। একটি বস্তুর উষ্ণতা অন্য একটি বস্তুর উষ্ণতা অপেক্ষা কম হইলেও, তাপের পরিমাণ প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশী থাকিতে পারে।

উষ্ণতার পরিমাণ:—আমরা সাধারণতঃ স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারি কোন বস্তু শীতল কি উষ্ণ এবং মোটামুটি ভাবে 'অত্যন্ত শীতল', 'শীতল', 'উষ্ণ', বা 'অত্যধিক উষ্ণ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারাই তাপের উষ্ণতার পরিমাণ নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু স্পর্শ করিয়া উষ্ণতার পরিমাণ নির্ভুল ভাবে স্থির করা যায় না।
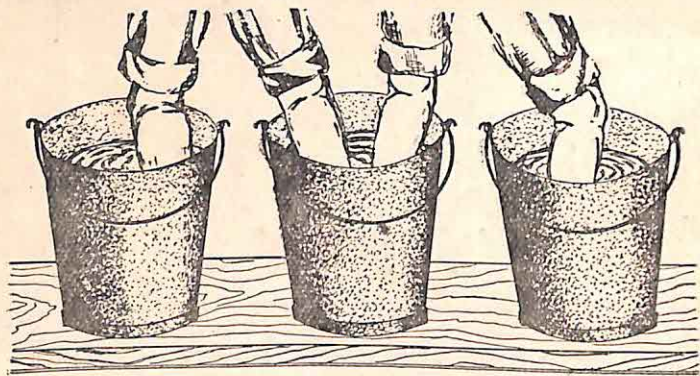
১নং—বরফজল ২নং—সাধারণ জল ৩নং—উত্তপ্ত জল

তিনটি পাত্রে পাশাপাশি তিন রকমের তাপের জল আছে। ১নং বালতিতে বরফজল, ২নং বালতিতে সাধারণ জল, আর ৩নং বালতিতে উত্তপ্ত জল। যদি বরফজলে কিছুক্ষণ হাত ডুবাইয়া

রাখিয়া পরে সেই হাত সাধারণ জলে ডুবান যায়, তবে সাধারণ জলই বেশ উষ্ণ মনে হইবে। আবার গরম জলে কিছুক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখিয়া সেই হাত যদি সাধারণ জলে ডুবান যায়, তবে উহা ঠাণ্ডা বোধ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় বালতির জলের তাপ একই রকম আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শরীরের তুলনায় কোন পদার্থ ঠাণ্ডা কিংবা গরম, স্পর্শ করিয়া কেবলমাত্র তাহাই বুঝা যায়; পদার্থের সঠিক তাপমাত্রা সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় না।

তাপমান যন্ত্র (Thermometer) ঃ তাপমাত্রা বা উষ্ণতা সঠিক ভাবে নির্ণয় করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে **তাপমান যন্ত্র** বলে।

তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি ঃ—তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করিতে একটি এক-মুখ-বন্ধ সূক্ষ্মছিদ্র-বিশিষ্ট কাচের নল লওয়া হয়। বদ্ধ প্রান্তটিকে অগ্নি-শিখায় ধরিয়া নরম করিয়া বিপরীত দিক হইতে ফুঁ দিয়া ঐ প্রান্তে একটি বদ্ধ গোলক বা বাল্‌ব তৈয়ারি করিতে হয়। খোলা প্রান্তটিকেও নরম করিয়া একটি ছোট বাটি তৈয়ারি করা হয়। নলটি খাড়াভাবে ধরিয়া বাটিটিতে একটু পারদ ঢালিয়া দিয়া অন্য প্রান্তের গোলকটি একটু গরম করিলে নলমধ্যস্থ বায়ু আয়তনে বাড়ে ও সামান্য বায়ু নলের খোলা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং গোলকটি ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের বায়ু সংকুচিত হওয়ায় একটুখানি পারদ বাটি হইতে নলের ভিতর নামে। এই ভাবে কয়েকবার গরম ও ঠাণ্ডা করায় নীচের গোলকটি পারদপূর্ণ হইয়া নলের কিছুদূর অবধি পারদ
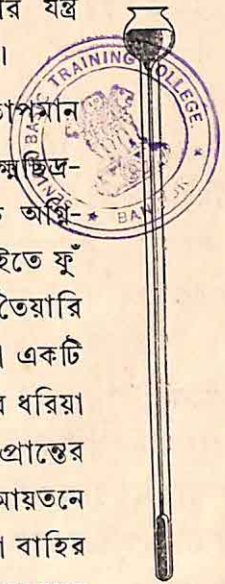
তাপমান যন্ত্র প্রস্তুতকরণ

উঠিলে বাটির অবশিষ্ট পারদটুকু ঢালিয়া রাখা হয় এবং গোলকের পারদকে গরম করা হয়। ইহাতে কাচের নলের ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যায় ও নলের ছিদ্রপথ পারদ-বাষ্পে ভরিয়া যায়। এই অবস্থাতে নলের খোলা মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যন্ত্রটি এইভাবে তৈয়ারি করার পর নলটিকে গলন্ত বরফে ডুবাইলে পারদ যেখানে নামে, সেখানে কাচের গায়ে একটি চিহ্ন দেওয়া হয়। আবার উহাকে ফুটন্ত জলের উপরে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখার পরে ভিতরের পারদ উপর দিকে যে পর্যন্ত উঠে, সেখানেও একটি চিহ্ন দেওয়া হয়। প্রথম চিহ্নটিকে ০ (শূন্য) ও দ্বিতীয় চিহ্নটিকে ১০০ ধরিয়া মধ্যবর্তী স্থানটিকে সমান একশত ভাগে ভাগ করিয়া ০ এর উপর দিকে যথাক্রমে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্কগুলি লিখিত হয়। এই এক একটি ভাগ ১° ডিগ্রী উষ্ণতা প্রকাশ করে। এই প্রকার থার্মমিটারের ০° ডিগ্রী উষ্ণতায় জল জমিয়া যায় ও ১০০° ডিগ্রী উষ্ণতায় জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। এই প্রকার থার্মমিটারকে **সেন্টিগ্রেড থার্মমিটার** বলে। সেন্টিগ্রেড কথাটির অর্থ 'শতভাগবিশিষ্ট'।

পারদের প্রয়োজনীয়তা :—সাধারণতঃ কঠিন পদার্থে তাপ দিলে উহা এত কম প্রসারিত হয় যে উহার দ্বারা সাধারণ তাপমান যন্ত্র নির্মাণ করা যায় না। আবার গ্যাসীয় পদার্থ তাপে অত্যন্ত বেশী প্রসারিত হয়। উহাও তাপমান যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। সেইজন্য তরল পদার্থের প্রসারণের দ্বারা সাধারণতঃ তাপমান যন্ত্র নির্মিত হয়। তরল পদার্থের ভিতর জল ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাষ্প হইয়া যায়। কিন্তু পারদ ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা আরও উচ্চ উষ্ণতায়ও তরল থাকে। সেইজন্য জলের বদলে পারদই ব্যবহার করা হয়।

উষ্ণতা পরিমাপের বিভিন্ন রীতি :—থার্মমিটারের গায়ের ডিগ্রীর দাগগুলি বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন মাপে চিহ্নিত করা হয়। **সেণ্টিগ্রেড** থার্মমিটারে গলন্ত বরফের উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রী ও ফুটন্ত জলের বাষ্পের উষ্ণতা একশত ডিগ্রী ধরা হয়। **রেমার** থার্মমিটারে প্রথমটিকে শূন্য ডিগ্রী ও দ্বিতীয়টিকে আশি ডিগ্রী ধরা হয় এবং **ফারেনহাইট** থার্মমিটারে গলন্ত বরফের উষ্ণতাকে ৩২° এবং ফুটন্ত জলের উষ্ণতাকে ২১২° ধরা হয়। আমাদের জ্বর পরীক্ষা করিবার জন্য যে ডাক্তারী তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, উহা ফারেনহাইট রীতিতে নির্মিত। উহাতে উষ্ণতার মাপ ৯৫° হইতে ১১০° পর্যন্ত থাকে। দেহের সংস্পর্শে পারদ যে দাগে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাই দেহের উষ্ণতার মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। সূক্ষ্ম-ভাবে মাপিবার জন্য এক এক ডিগ্রীকে আবার দশ ভাগে ভাগ করা হয়। তীর-চিহ্নিত স্থানটি সুস্থ শরীরের উষ্ণতা নির্দেশ করে।
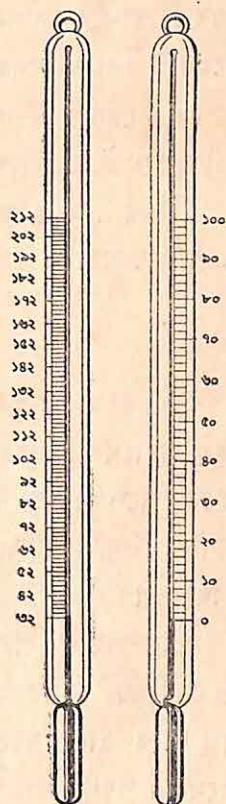
ফারেনহাইট ও সেণ্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্র

বিভিন্ন প্রকার থার্মমিটার

(১) **সেণ্টিগ্রেড** :—ইহার কথা সবিশেষ পূর্বে বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানের কাজকর্ম সাধারণতঃ সেন্টিগ্রেড স্কেলেই হইয়া থাকে।

(২) **ফারেনহাইট** :—ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্রে গলন্ত বরফের উষ্ণতা ৩২° ও ফুটন্ত জলের উপরের বাষ্পের উষ্ণতা ২১২° ধরিয়া মধ্যবর্তী স্থানকে সমান ১৮০° ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়। আমাদের দেহের উষ্ণতা ফারেনহাইট পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।

(৩) রেমার :—এই থার্মমিটারে গলন্ত বরফের উষ্ণতাকে ০° এবং ফুটন্ত জলের বাষ্পের উষ্ণতাকে ৮০° ধরা হয়।

বিভিন্ন ডিগ্রীর সম্বন্ধ :—সেন্টিগ্রেডের এক ডিগ্রী = $\frac{১৮০}{১০০}$ = $\frac{৯}{৫}$ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং $\frac{৮০}{১০০}$ = $\frac{৪}{৫}$ ডিগ্রী রেমার।

তাপ-সঞ্চালন

উত্তপ্ত বস্তুর ধর্ম : তাপ পদার্থকে উত্তপ্ত করে। কিন্তু উত্তপ্ত পদার্থের ভিতরে তাপ স্থিরভাবে থাকে না। তাপ তপ্ত বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। তাপের এই সঞ্চালন তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে—**পরিবহণ, পরিচলন** ও **বিকিরণ**।

তাপের পরিবহণ (Conduction) : যদি একটি লৌহ-দণ্ড উনানের অগ্নির মধ্যে রাখা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় অগ্নির তাপ ধীরে ধীরে দণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া আসে। পদার্থ মাত্রই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বা কণা দ্বারা গঠিত। লৌহদণ্ডটিও কতকগুলি অণুর **সমষ্টি**। উনানের অগ্নিতে প্রথমতঃ দণ্ডের ঐ প্রান্তের কণাগুলি উষ্ণ হয়। সেই উষ্ণ কণাগুলি তাহাদের পার্শ্ববর্তী কণাগুলিকে তাপ দিয়া উষ্ণ করে। উহারা আবার পরবর্তী কতকগুলি কণাকে উষ্ণ করে। এই ভাবে দণ্ডের এক প্রান্ত হইতে উত্তাপ অপর প্রান্তে উপস্থিত হয়। অবশেষে

সমস্ত লৌহদণ্ডটি উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। তাপের এইভাবে সঞ্চালনের নাম **পরিবহণ**। কঠিন পদার্থ মাত্রই পরিবহণ প্রণালীতে উষ্ণ হইয়া থাকে।

পরিচলন (Convection)ঃ তরল ও বায়বীয় পদার্থসমূহ পরিবহণ প্রণালীতে উত্তপ্ত হয় না। এক কেটলি জল উনানে চাপাইলে কেটলির তলদেশ প্রথমতঃ উত্তপ্ত হয়। উষ্ণ তলদেশের সংস্পর্শে জলের নিম্নভাগের কণাগুলি উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং উপরিভাগের শীতল ভারী কণাগুলি নীচে নামে ও উত্তপ্ত তলদেশের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে। এইরূপে উপর হইতে নীচে উঠা-নামা করিতে করিতে সমস্ত জল সমান-ভাবে উত্তপ্ত হইয়া শেষে ফুটিতে আরম্ভ করে। এই প্রকার তাপ-চলাচলকে তাপের **পরিচলন** বলে। একটি পরীক্ষার সাহায্যে তাপের এই পরিচলন-ক্রিয়াটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

পরিচলন

পরীক্ষাঃ—একটি কাচের পাত্রে (ফ্লাস্কে) জল লও এবং সামান্য পরিমাণে মেজেণ্টা রঙের গুঁড়া উহার তলায় ফেলিয়া পাত্রটিকে ধীরে ধীরে আগুনের উত্তাপে গরম করিতে থাক। জল গরম হইতে থাকিলে মেজেণ্টা রঙের স্রোত উপরে উঠিয়া আবার নীচের দিকে নামিয়া আসিবে। এইভাবে ক্রমাগত স্রোতের উঠা-নামা দ্বারা সমস্ত জল উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।
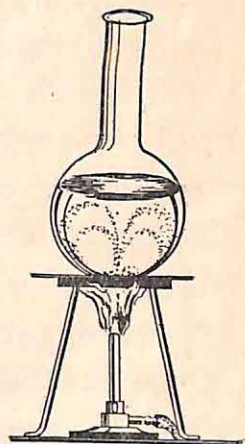
গ্যাসীয় পদার্থগুলি সাধারণতঃ পরিচলন প্রণালীতেই গরম

হয়। গ্রীষ্মকালে বায়ু এই পরিচলন প্রণালীতেই উত্তপ্ত হইয়া থাকে। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে ও উপরের বায়ু নীচে নামিয়া ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসিয়া উত্তপ্ত হয়। ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে ও বায়ু উত্তপ্ত হয়।

বিকিরণ (Radiation)ঃ একটি জ্বলন্ত উনানের একপাশে বসিয়া থাকিলে আমরা তাপ অনুভব করি। এখানে কোন কঠিন বা তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়া তাপ আমাদের দেহের দিকে আসিতেছে না। তথাপি আমরা তাপ অনুভব করি। এইরূপে কোন পদার্থের সাহায্য ভিন্ন যে প্রণালীতে তাপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় তাহাকে তাপের **বিকিরণ** বলে। এই বিকিরণের দ্বারাই সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে।

পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণের পার্থক্যঃ—তাপ পরিবহণে পদার্থের কণাগুলি স্থান পরিবর্তন করে না। কিন্তু পরিচলনে কণাগুলি স্থান পরিবর্তন করে। পরিচলন প্রণালীতে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের যে কণাগুলি উত্তপ্ত হয়, সেগুলি শীতল স্থানে চলিয়া যায় ও শীতল স্থানের কণাগুলি উত্তপ্ত স্থানে আসে। বিকিরণ প্রণালীতে তাপ শূন্যের মধ্যে বিকীর্ণ হয় ও যে পদার্থের উপর পড়ে তাহাকেই উত্তপ্ত করে।

সু-পরিবাহক ও কু-পরিবাহকঃ সকল পদার্থের তাপ-পরিবহণ ক্ষমতা সমান নয়। তামা ও রূপার পরিবহণ ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশী, লৌহ ও সীসার কম ; কাঠ, কাচ ইত্যাদির আরও কম। যে সব পদার্থের তাপ-পরিবহণের ক্ষমতা বেশী, তাহাদিগকে তাপের **সু-পরিবাহক** (Good conductors of heat) ও যাহাদের তাপ-পরিবহণের ক্ষমতা কম, তাহাদিগকে **কু-পরিবাহক** (Bad

conductors of heat) বলে। তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, রূপা লোহা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ মাত্রই প্রায় সু-পরিবাহক। রেশম, পশম, পালক, কাঠ, কাচ ইত্যাদি কু-পরিবাহক। তোমরা দেখিয়াছ অ্যালুমিনিয়াম কেটলির হাতলে বেত জড়ান থাকে। অ্যালুমিনিয়াম সু-পরিবাহক কিন্তু বেত কু-পরিবাহক। সেজন্য অ্যালুমিনিয়াম পাত্র অত্যন্ত গরম হইলেও বেত-জড়ান হাতল ধরিয়া নামাইতে কোন অসুবিধা হয় না। পশম ও পালক তাপের কু-পরিবাহক বলিয়া পশুপাখি শীতে কষ্ট পায় না; এবং শীতের দিনে গরম অর্থাৎ পশমের জামা গায়ে দিলে আমাদের ঠাণ্ডা লাগে না। জল তাপের কু-পরিবাহক। কাচের একটি পরীক্ষা-নলের ভিতর কিছু জল লইয়া একটি স্পিরিট ল্যাম্পের উপরে কাত করিয়া ধর। তলার দিকটা তুমি হাতে ধরিয়া থাকিবে, আর উপরের দিকটায় বাতির উত্তাপ লাগাইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে উপরের দিকের জল ফুটিতে আরম্ভ করিল কিন্তু নীচের দিকের জল ঠাণ্ডাই রহিয়াছে।
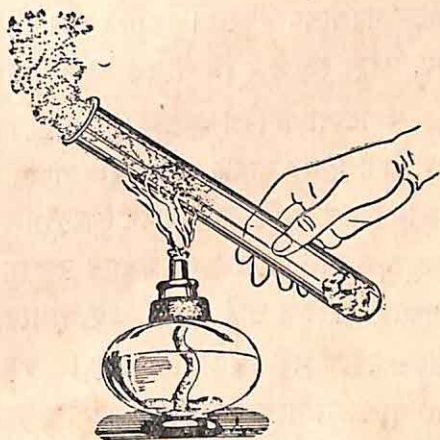
জল কু-পরিবাহক

আলোক

আলোর ধর্ম ঃ—আলোক এক প্রকার শক্তি। ইহা আমাদের চক্ষুর উপর ক্রিয়া করিয়া আমাদিগকে দৃষ্টিশক্তি দান করে। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখিতে পাই না। আলো নিজে অদৃশ্য কিন্তু উহা কোন বস্তুর উপর পড়িলে আমরা সেই বস্তুটি দেখিতে পাই। একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে যখন সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে ঢোকে, তখন আলোর পথে যে সব ধূলিকণা থাকে, সেগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা মনে করি, আলো দেখিতেছি কিন্তু আসলে আমরা আলো দেখি না, আলোময় বা আলোকিত পদার্থই দেখিয়া থাকি। আলোর রশ্মি উৎপত্তিস্থল হইতে চারিদিকে সরলরেখায় চলে। যদি কোন কারণে উহার পথের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে নূতন পথেও সরলরেখায় চলিতে থাকে।

আলোক বিকিরণঃ পণ্ডিতেরা বলেন, সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া ঈথার নামক অদৃশ্য স্বচ্ছ পদার্থ বিদ্যমান। সূর্য এবং যে-কোন উত্তপ্ত দীপ্তিমান পদার্থের অণুগুলি কম্পমান। এই কম্পমান অণুগুলি চারিদিকের এই ঈথারে কম্পন জাগায় ও ছোট বড় নানা প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই ঈথারের তরঙ্গগুলি প্রতি সেকেণ্ডে প্রচণ্ড বেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বড় তরঙ্গগুলি কোন পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে উহা উত্তপ্ত হয়। উহারা আমাদের দেহে লাগিলে আমরা তাপ অনুভব করি। কিন্তু ছোট তরঙ্গগুলি নানা বস্তুর উপর পড়িয়া আলোকরূপে প্রতীয়মান হয় এবং আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায়। অনেক পদার্থের মধ্য দিয়া আলো অবাধে যাইতে পারে। তাহাদিগকে **স্বচ্ছ পদার্থ** বলা হয়। বায়ু, জল ও কাচ স্বচ্ছ পদার্থ। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পদার্থ চোখে দেখা যায় না।

অধিকাংশ পদার্থের ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না; সেগুলি **অস্বচ্ছ পদার্থ**। আলোকরশ্মি কোন বস্তুতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষুতে পড়িলে আমরা সেই বস্তুটি দেখিতে পাই।

আলোকশক্তির ক্রিয়া :—নানা পদার্থের উপর আলোকশক্তির ক্রিয়ার প্রভাব দেখা যায়। যখন তুমি ফটো তোলাইবার জন্য ক্যামেরার সম্মুখে বসিয়া থাক, তখন তোমার দেহ হইতে প্রতিফলিত আলো ফটো প্লেটে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। এই জন্যই তোমার ফটো তোলা সম্ভব হয়। আলোকের সাহায্যেই উদ্ভিদেরা পাতায় শ্বেতসার প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অঙ্গার-আত্মীকরণ: শরীর গঠনের জন্য প্রত্যেক জীবেরই অঙ্গারের প্রয়োজন। উদ্ভিদেরা এই অঙ্গার বায়ুর অঙ্গারাম্ল গ্যাস হইতে সংগ্রহ করে। একদিকে বায়ুর সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস পাতার রন্ধ্রের ভিতর দিয়া পাতায় প্রবেশ করে, আর একদিকে মূলরোম দিয়া মাটি হইতে শোষিত রস মূল, কাণ্ড ও পাতার নালিকাপুঞ্জের ভিতর দিয়া পাতায় যায়। এখানে পাতার **সবুজ কণা** ও **সূর্যকিরণের** সাহায্যে জল ও অঙ্গারাম্ল গ্যাসের নানা প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। ইহাতে শর্করা প্রস্তুত হয় ও অক্সিজেন মুক্ত হইয়া বায়ুতে মিশে। ইহাকেই অঙ্গার-আত্মীকরণ বলে। এই অঙ্গার-আত্মীকরণ সূর্যের আলোক ব্যতীত হইতে পারে না। সূর্যের আলোক বৃক্ষের প্রাণস্বরূপ। একটি উদ্ভিদ-শিশুকে যদি কোন অস্বচ্ছ পাত্র দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সূর্যালোকের অভাবে উহা ক্রমশ বিবর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। একটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এ ব্যাপারটি সব বুঝিতে পারিবে।

পরীক্ষা ঃ—একটি কাচপাত্রে কিছু শেওলা লইয়া উহার উপর একটি কাচের ফানেল উপুড় করিয়া বসাও। এবার পাত্রে কিছু জল ঢাল। লক্ষ্য রাখিবে, ফানেলের নলটি যেন জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। এখন একটি পরীক্ষা-নল জলপূর্ণ করিয়া উহার মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ কর, এবং বন্ধ অবস্থাতেই উহা ফানেলের উপর উপুড় করিয়া বসাইয়া দাও। লক্ষ্য রাখিও যেন পরীক্ষা-নল হইতে একটুও জল বাহির হইয়া না যায়। এইবার কাচপাত্রটি ৪।৫ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিয়া দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখিবে শেওলাগুলি হইতে বুদ্‌বুদ উঠিয়া পরীক্ষা-নলের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছে ও জল পরীক্ষা-নল হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিতেছে। যখন বেশ একটুখানি জল পরীক্ষা-নল হইতে নামিয়া যাইবে, তখন উহা আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া বাহিরে আন এবং একটি শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি উহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে কাঠিটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতে বুঝা গেল যে পরীক্ষা-নলের ভিতরে অম্লজান সঞ্চিত হইয়াছিল। শেওলা আলোকের সাহায্যে বায়ুর অঙ্গারাম্লের অঙ্গার গ্রহণ করিয়া অম্লজান ছাড়িয়া দিয়াছিল; তাহাই পরীক্ষা-নলে সঞ্চিত হইয়াছিল। সূর্যের আলো না পাইলে উদ্ভিদের পক্ষে শর্করা প্রস্তুত করা এবং অম্লজান ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। শেওলার পাত্রটি অন্ধকার ঘরে রাখিলে জলে কোন বুদ্‌বুদ উঠিবে না।
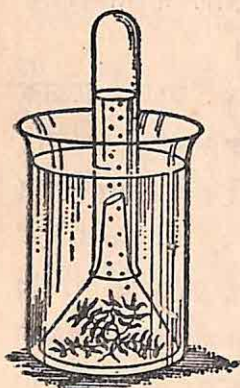
অঙ্গার আত্মীকরণের পরীক্ষা

অনুশীলনী

১। শক্তি কাহাকে বলে? সূর্য সকল শক্তির উৎস—এ কথার তাৎপর্য কি?

২। খাদ্য মানুষের শক্তি যোগায়—এ কথার ব্যাখ্যা কর।

৩। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের উপর তাপের কিরূপ ক্রিয়া হয় বল।

৪। তাপে অবস্থা ও আকার পরিবর্তনের কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর।

৫। তাপমান যন্ত্র কি? সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইটের ডিগ্রীতে কি পার্থক্য?

৬। তাপ-সঞ্চালন কাহাকে বলে? কি কি উপায়ে তাপ সঞ্চালিত হয়?

৭। পরিচলন ও পরিবহণের মধ্যে কি পার্থক্য আছে বুঝাইয়া বল।

৮। বিকিরণ কাহাকে বলে? কিরূপে বিকিরণ হয়?

৯। জল যে তাপের কু-পরিবাহক তাহা কিরূপে দেখাইতে পার?

১০। আলোর ধর্ম কি? আলোক যে শক্তি তাহা কিরূপে বুঝা যায়?

১১। "সূর্যালোক ব্যতীত উদ্ভিদের অঙ্গার-আত্মীকরণ সম্ভব নয়"—ইহা কিরূপে প্রমাণ করিতে পার?

১২। কিরূপে থার্মমিটার প্রস্তুত করা হয়, বুঝাইয়া বল।

চতুর্থ অধ্যায়

জীব

জীব ও জড়ের প্রভেদ

জড়পদার্থঃ পৃথিবীতে তিন প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণী। যাহাদের প্রাণ নাই তাহাদিগকে **অচেতন** বা **জড়পদার্থ** বলে। জল, বায়ু, ধাতু, মাটি, কয়লা প্রভৃতি সমস্তই জড়পদার্থের অন্তর্গত। ইহারা নির্জীব।

সজীব পদার্থঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাণ ও চেতনা আছে বলিয়া ইহাদিগকে **সচেতন** বা **সজীব পদার্থ** বলা হয়। সজীব পদার্থে শ্বাস ও প্রশ্বাস, জন্ম ও মৃত্যু, আহার ও বৃদ্ধি, শ্রম ও বিশ্রাম প্রভৃতি জীবনের লক্ষণাদি দেখা যায়। জড়পদার্থের মধ্যে এ সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

জীবদেহের উপাদানঃ জীবদেহের প্রধান উপাদান **জীবকোষ**। জীবকোষের ভিতরে জেলির মত এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ আছে, তাহার নাম **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (Protoplasam)। উচ্চশ্রেণীর জীবকোষের স্বচ্ছ প্রোটোপ্লাজ্‌মের একটি অংশ অন্যান্য অংশ হইতে ঘন। এই ঘন অংশটিই প্রোটোপ্লাজ্‌মের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের নাম **নিউক্লিয়স** (Nucleus)। এই নিউক্লিয়স্‌ই জীবকোষের প্রাণকেন্দ্র। জীবের দেহ অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত। কতকগুলি জড়পদার্থ এই জীবকোষের উপাদান। জড়বস্তু হইতেই প্রাণময় জীবকোষের উৎপত্তি হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান

ডিম্বকোষ সাজান থাকে। ফুল ফুটিলে নানা উপায়ে পরাগকোষের পরাগরেণু সেই গাছের বা অন্য গাছের ফুলের **গর্ভমুণ্ডের** সহিত লাগিয়া যায়। ইহাকে পরাগসংযোগ বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন উপায়ে, যথা বায়ু, জল, পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের সাহায্যে এই পরাগসংযোগ সাধিত হয়। ইহার ফলে গর্ভকোষ ও ডিম্বকোষ যথাক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়। এই সময় ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে। তখন ফল বা গুটি দেখা যায়। এইভাবে ফুল হইতে ফল হয় এবং ফলের ভিতরে বীজ থাকে। বীজ হইতেই নূতন গাছ জন্মায়। সুতরাং পরাগসংযোগ দ্বারা বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করাই ফুলের একমাত্র কাজ।

সরল উদ্ভিদ ও প্রাণী

সরল উদ্ভিদঃ তোমরা জান জীব এককোষী বা বহুকোষী। এককোষী জীবের জীবনযাত্রা সাধারণতঃ সরস এবং বহুকোষী জীবের জীবনযাত্রা সাধারণতঃ জটিল। এককোষী জীবকে একটিমাত্র কোষের সাহায্যেই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কার্য করিতে হয়। এককোষী উদ্ভিদ সাধারণতঃ কোষবিভাগের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেইজন্যই ইহাদের জীবনে বিশেষ জটিলতা দেখা যায় না। এককোষী উদ্ভিদের ভিতর একটি **মাতৃকোষ** থাকে। এই মাতৃকোষ হইতেই একটি **অপত্যকোষের** সৃষ্টি হয়। পরে উহা বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন তুইটি উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

ঈস্টঃ ঈস্ট একপ্রকার এককোষী উদ্ভিদ। ইহা সাধারণতঃ ফল, ফুলের মধুগ্রন্থি, আঙ্গুর-ক্ষেতের মাটি প্রভৃতি স্থানে জন্মায়। ইহাদিগকে মৃতজীবী উদ্ভিদ বলে। কতকগুলি ঈস্ট পরজীবী

শ্রেণীর অন্তর্গত। এইগুলি অন্যান্য উদ্ভিদ, প্রাণী, এমন কি মানুষের শরীরেও পরজীবী রূপে বাস করে।

ঈস্টের দেহ ঃ—ঈস্টের দেহ ডিম্বাকৃতি। ইহার কোষের প্রাচীর বা আবরণ অত্যন্ত পাতলা। কোষের ভিতরে একটিমাত্র প্রোটোপ্লাজ্‌ম থাকে এবং সেই প্রোটোপ্লাজ্‌মের ভিতরে একটিমাত্র নিউক্লিয়স থাকে।

ঈস্টের বংশবৃদ্ধি ঃ—ঈস্ট এককোষী উদ্ভিদ। ইহার বংশবৃদ্ধির জন্য পরাগমিলন বা বীজ-উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। অত্যন্ত সহজ ও সরল উপায়ে ইহাদের বংশ-বৃদ্ধি ঘটে। ঈস্টের প্রোটোপ্লাজ্‌মের ভিতরের নিউক্লিয়সটি প্রাকৃতিক কারণে মুকুলোদ্গম দ্বারা ক্রমশ দুইটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং মূল কোষটি সংকুচিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুই কোষেই দুইটি পৃথক নিউক্লিয়স উৎপন্ন হয়। পরে কোষপ্রাচীর দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া কোষ দুইটি পৃথক হইয়া যায়। এইভাবে একটি ঈস্ট হইতে দুইটি ঈস্ট উৎপন্ন হয়। আবার কখনও কখনও দুইটি ঈস্ট গায়ে গায়ে লাগিয়া উহা হইতে একটি ক্ষুদ্র অংশ বাহির হয় এবং ঐ দুইটি যুক্ত হইয়া ডাম্বেলের আকার প্রাপ্ত হয়। প্রথমতঃ দুইটি নিউক্লিয়স মিলিত
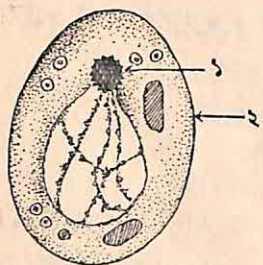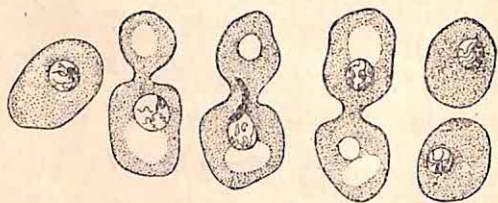
ঈষ্ট ঃ ১—নিউক্লিয়স, ২—কোষপ্রাচীর

মুকুলোদ্গম দ্বারা বিভাগ

হইয়া একটি নিউক্লিয়স প্রস্তুত করে। ক্রমে সেই একটি নিউক্লিয়সই আবার দুইটি এবং সেই দুইটি ক্রমে চারিটি এবং সেই চারিটি অবশেষে আটটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া একটি ঈস্ট হইতে আটটি ঈস্ট জন্মায়।
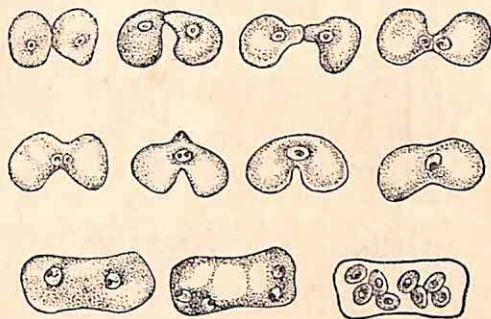
ঈস্টের বংশবৃদ্ধি

ঈস্টের কার্য ঃ— খেজুরের রস, পুরাতন মদ্য ইত্যাদিতে ঈস্ট জন্মায়। মিষ্ট রসকে উহারা সুরাসারে পরিণত করে। সেইজন্য মদ্যশিল্পে ঈস্টের অর্থনৈতিক মূল্য কম নহে। খেজুরের রস কোন জায়গায় রাখিয়া দিলে সেই রস গাঁজিয়া উঠে। ঐ রসে বহু ঈস্ট উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা গাঁজিতে থাকে। মিষ্ট রসে ঈস্টরা একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন করে ; তাহাতে ফেনা হয়। উহারা সেই রসে বাস করিতে থাকে। মিষ্ট রসে যদি অল্প পরিমাণে অম্লজান সরবরাহ হয়, তাহা হইলে ঈস্ট বেশী সুরাসার উৎপন্ন করে ; আর বেশী পরিমাণে অম্লজান সরবরাহ হইলে কম সুরাসার প্রস্তুত হয়।

আমিবা ঃ আমিবা প্রাণিজগতে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের আদিম প্রাণী। ইহাদেরও উদ্ভিদশ্রেণীর ঈস্টের মতই মাত্র একটি কোষ। ঐ একটি কোষের সাহায্যেই ইহারা জীবনের সমস্ত কার্য

করিতে পারে। এই শ্রেণীর প্রাণীদের প্রোটোজাআ বা আদ্যপ্রাণী বলা হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ইহাদের দেখা যায় না।
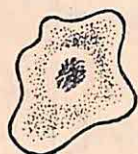
পূর্ণ আমিবা
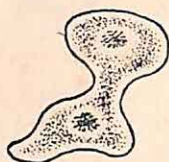
বিভাগের মুখে

আমিবা সাধারণতঃ বদ্ধজলে বাস করে। অনেক সময় ইহারা অন্যান্য প্রাণীর দেহে পরজীবী রূপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই আমিবা যখন জলের সহিত মিশিয়া আমাদের পৌষ্টিক নালীতে আশ্রয় লয়, তখন আমাদের আমাশয় রোগ হয়।

বিভাগের প্রায় শেষ অবস্থা

সম্পূর্ণ বিভক্ত

আমিবার বংশবৃদ্ধি ঃ ইহাদের বংশবৃদ্ধির নিয়ম অত্যন্ত সরল। একটি মাত্র কোষের ভিতরেই ইহাদের মাতৃকোষ হইতে সন্তানকোষ জন্মায় এবং ধীরে ধীরে কোষটি হইতে পৃথক হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র আমিবায় পরিণত হয়।
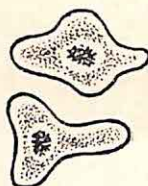
মস ঃ বর্ষাকালে ভিজা দেওয়ালের উপর সবুজ রঙের কার্পেটের মত একপ্রকার উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের নাম **মস**। উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় আধ ইঞ্চি। এই ক্ষুদ্র দেহটিতে কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু মূল নাই। কাণ্ডটি সরু, খাড়া ও শাখাযুক্ত। ইহার উপরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃন্তহীন পাতা ঘনভাবে বিন্যস্ত থাকে। মূলের

পরিবর্তে মসের কাণ্ডের নীচ হইতে রাইজয়েড নামক অসংখ্য বহুকোষ-যুক্ত সূত্র নির্গত হয়। এই সূত্রগুলির সাহায্যে উহারা মাটি বা দেয়ালের সঙ্গে নিজদিগকে আটকাইয়া রাখে এবং খাদ্য রস শোষণ করে।

মস নিম্নস্তরের উদ্ভিদ হইলেও উহা ঈস্টের মত এককোষী উদ্ভিদ নয়। অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মত ইহা সবুজপাতা ও সূর্যের আলোকের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। উহাদের বংশবৃদ্ধিও অনেকটা উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মতই পরাগমিলন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। পরাগ-সংযোগের পর মসের শীর্ষদেশে একটি সরু বৃন্ত নির্গত হয়; তাহার মাথায় একটি সবুজ রঙের থলি থাকে। থলিটির মধ্যে এক প্রকার রেণু থাকে। পূর্ণাঙ্গ হইলে থলিটি ফাটিয়া যায় ও রেণুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। রেণুগুলি আর্দ্রস্থানে পড়িলে তাহা হইতে একপ্রকার শাখাযুক্ত সূত্র চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই সূত্রগুলির পার্শ্ব-মুকুল হইতে নূতন মস উৎপন্ন হয়।
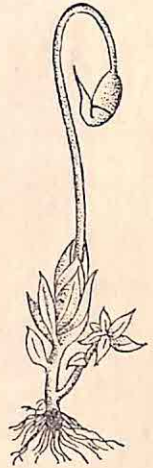
মস

মানব-দেহ

মানব দেহঃ মানব-দেহ একটি আশ্চর্যজনক যন্ত্র। ইহার অভ্যন্তরে যে কত প্রকারের কলকব্জা আছে, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

মৃৎশিল্পী যখন মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করে, তখন সে যেমন কাঠ, খড় প্রভৃতি দিয়া একটি কাঠামো প্রস্তুত করিয়া লয়, ঠিক তেমনই আমাদের এই মানব-দেহেরও একটি কাঠামো আছে।

মানুষের রক্তমাংসময় দেহ একটি হাড়ের কাঠামোর উপর অধিষ্ঠিত। হাত-পা টিপিলেই বেশ বুঝা যায় যে নরম মাংসের নীচে শক্ত হাড় রহিয়াছে। এই হাড় দিয়াই আমাদের কাঠামো বা **কঙ্কালটি** নির্মিত। কঙ্কালের উপর **মাংসপেশী,** তাহার উপর সামান্য **চর্বি** এবং তাহার উপর ত্বক বা **চামড়া** রহিয়াছে। মাংসপেশী-গুলি হাড় বা অস্থির সহিত এক-প্রকার বন্ধনী দিয়া বাঁধা থাকে এবং একখানি অস্থি অপর একখানি অস্থির সহিত সন্ধির সাহায্যে যুক্ত থাকে। পরিণত বয়সে মানব-দেহে ২০৬ খানা অস্থি থাকে। অস্থিগুলি দিয়া কঙ্কালটি এমনভাবে গঠিত এবং বিভিন্ন অঙ্গের সন্ধিগুলি এমন কৌশলের সহিত নির্মিত যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন মত এদিক ওদিক ঘুরিবার বাধা হয় না।
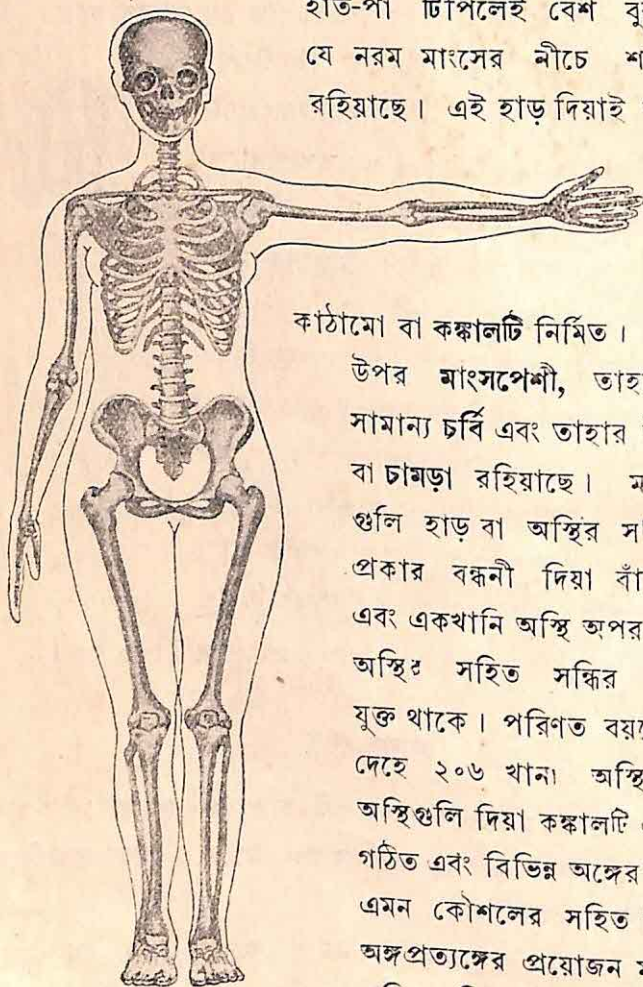
নর-কঙ্কাল

বাহ্যতঃ মানব-দেহে তিনটি প্রধান অংশ দেখা যায়—(১) **মস্তক,** (২) **দেহকাণ্ড** ও (৩) **প্রত্যঙ্গ।**

১। **মস্তক**ঃ মানব-দেহের সর্বোচ্চ অংশ **করোটি** বা **মাথার খুলি**। ইহা ৮ খানি চেপটা-অস্থি-নির্মিত একটি কৌটা-বিশেষ। ইহার মধ্যে মানবের মস্তিষ্ক থাকে।
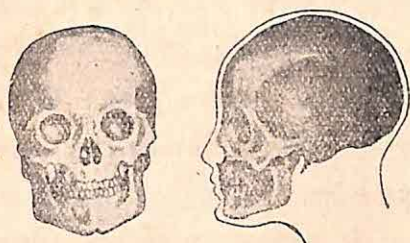
মস্তিষ্ক বুদ্ধি, স্মৃতি এবং সকল প্রকার অনুভূতির কেন্দ্র। মস্তিষ্কের সম্মুখের দিকে নীচের অংশের নাম **মুখমণ্ডল**। এই মুখমণ্ডলে **চক্ষু**, **কান**, **নাক**, **ঠোঁট** ও **মুখগহ্বর** আছে। মুখমণ্ডলে সর্বসমেত কুড়িখানি অস্থি আছে।

করোটি

২। **দেহকাণ্ড**ঃ দেহের মধ্যভাগকে **দেহকাণ্ড** বলা হয়। ইহারও তিনটি অংশ আছে; **গ্রীবাদেশ**, **বক্ষস্থল** ও **উদর**। দেহকাণ্ডের প্রধান অস্থির নাম **মেরুদণ্ড**। সেই মেরুদণ্ডটি তেত্রিশটি খণ্ডাস্থি বা কশেরুকার দ্বারা গঠিত বন্ধনীর সাহায্যে এই কশেরুকাগুলি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দণ্ডাকারে আবদ্ধ থাকে। ইহাদের ভিতর, গ্রীবায় সাতখানি, পৃষ্ঠদেশে বারোখানি, কটিতে পাঁচখানি, বস্তিতে পাঁচখানি ও তাহার নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিখানি কশেরুকা আছে। বস্তির পাঁচখানি ও তাহার নিম্নের চারিখানি অস্থি পরিণত বয়সে তুই-খানিতে পরিণত হয়।

কশেরুকাগুলির মধ্য দিয়া উপর হইতে নীচ পর্যন্ত একটি ছিদ্র-পথ আছে। তাহার মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক হইতে **মেরুরজ্জু** লম্বমান রহিয়াছে।

মস্তক ও দেহকাণ্ডের ভিতর তিনটি গহ্বর আছে—(ক) মুখগহ্বর, (খ) বক্ষগহ্বর ও (গ) উদরগহ্বর।

(ক) **মুখগহ্বর :** ঠোঁট দুইটি মুখগহ্বরের দ্বার-স্বরূপ। ইহার পরেই দুইপাটি দাঁত আছে এক এক পাটিতে ১৬টি করিয়া মোট ৩২টি দাঁত থাকে। কর্তন, ছেদন ও পেষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য দাঁতগুলির গঠন বিভিন্ন। উপর ও নীচের পাটির সম্মুখে চারিটি করিয়া আটটি বাটালির মত চেপটা দাঁত আছে। ইহাদের **কৃন্তক দাঁত** বলা হয়। কৃন্তক দাঁতের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া মোট চারিটি কুকুরের দাঁতের মত দাঁত আছে; ইহাদের **শ্বদন্ত** বলে। ইহাদের দ্বারা খাদ্যবস্তু কাটা হয়। এই দাঁতগুলির পার্শ্বে দুইটি করিয়া মোট আটটি **চর্বণ দন্ত** আছে এবং চর্বণ দন্তের দুইপাশে তিনটি করিয়া বারটি **পেষণ দাঁত** আছে। মুখগহ্বরের ভিতরের দিকে গলবিল থাকে। গলবিলের দুই পাশে দুইটি **তালুগ্রন্থি** আছে। গলবিলের উপর দিকে একটি মাংসপিণ্ড আছে। তাহার নাম **আলজিভ**। গলবিলের মধ্যে **শ্বাসনালী** ও **গলনালী**। শ্বাসনালীর উপরে একটি ঢাকনা আছে। খাইবার সময় সেই ঢাকনাটি শ্বাস-নালীকে বন্ধ করিয়া দেয় এবং খাদ্য গলনালী দিয়া নামিয়া যায়। এই কার্যে কোন গোলযোগ ঘটিলেই খাদ্যকণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে; ইহাতে ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়। ইহাকেই আমরা ‘বিষম লাগা’ বলি।

(খ) **বক্ষগহ্বর :** দেহকাণ্ডের উপরের দিকে অবস্থিত বক্ষ-গহ্বর দেখিতে অনেকটা খাঁচার মত। মানুষের ধড়ের অভ্যন্তর-ভাগ মাংসপেশী-নির্মিত একখানা পর্দার দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। এই পর্দার নাম **মধ্যচ্ছদা**। মধ্যচ্ছদার উপরের অংশ

বুক, নীচের অংশ উদর। বুকের **সম্মুখভাগে উরঃফলক,** পশ্চাদ্‌ভাগে মেরুদণ্ডের ১২টি কশেরুকা এবং দুই পার্শ্বে ১২ জোড়া **পাঁজর**। উপরের দশ জোড়া পাঁজর উরঃফলক ও মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত কিন্তু নীচের দুই জোড়া উরঃফলকের সহিত যুক্ত নহে। ইহাদের **মুক্ত পাঁজর** বলে। বক্ষগহ্বরের দুই-পাশে দুইটি গোলাপী রঙের **ফুসফুস** আছে। দুই ফুসফুসের মধ্যস্থলে ঈষৎ বাম পার্শ্বে **হৃৎপিণ্ড** অবস্থিত। ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্যের দ্বারা রক্ত বিশোধিত হয়। হৃৎপিণ্ড সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে।
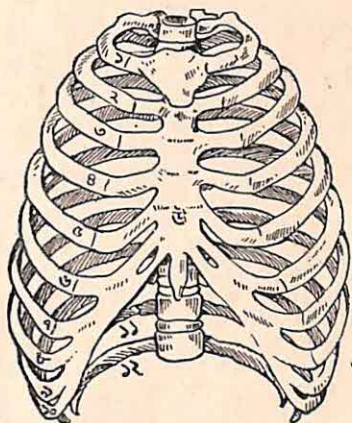
১—১২ পাঁজর ; উ—উরঃফলক

(গ) **উদরগহ্বর** :—দেহকাণ্ডের নীচের অংশের নাম **উদরগহ্বর**। ইহা মধ্যচ্ছদার নীচে অবস্থিত। গলনালী মধ্যচ্ছদা ভেদ করিয়া নীচে **পাকস্থলীতে** গিয়া মিশিয়াছে। এই গহ্বরের ভিতরে **অন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক, বস্তি** এবং কয়েকটি রস-নিঃসারক গ্রন্থি আছে।

৩। **প্রত্যঙ্গ** : প্রত্যঙ্গ বলিতে হাত, পা প্রভৃতি বুঝায়। ইহারা দেহের শাখা।

হাতের তিনটি অংশ—**প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ ও হস্ত**। কনুই-এর উপরিভাগ প্রগণ্ড, কনুই হইতে কব্‌জি পর্যন্ত প্রকোষ্ঠ এবং কব্‌জির পরবর্তী অগ্রভাগকে হস্ত বলে। পায়েরও এইরূপ তিনটি অংশ—**উরু, জঙ্ঘা ও চরণ**।

মানব-দেহের উপাদানঃ সমস্ত প্রাণীর দেহের মত মানব-দেহও নানা প্রকার জীবকোষ দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন প্রকার কোষের সমবায়ে রক্ত, মাংস অস্থি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কলা বা টিস্যু প্রস্তুত হয়। নানা শ্রেণীর কলার সমবায়ে শরীরের সমস্ত যন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠিত।

আমাদের দেহের অস্থিগুলিকে আকার হিসাবে চারিভাগে ভাগ করা হয়—(১) **লম্বা** অস্থি, (২) ছোট অস্থি, (৩) চেপটা অস্থি, (৪) **অসম** অস্থি।

আমাদের শরীরের ভিতরের তরল অংশ **রক্ত**। রক্তের রং উজ্জ্বল লাল। রক্তের প্রধান উপাদান **রক্তরস, লোহিত কণিকা,** শ্বেত কণিকা
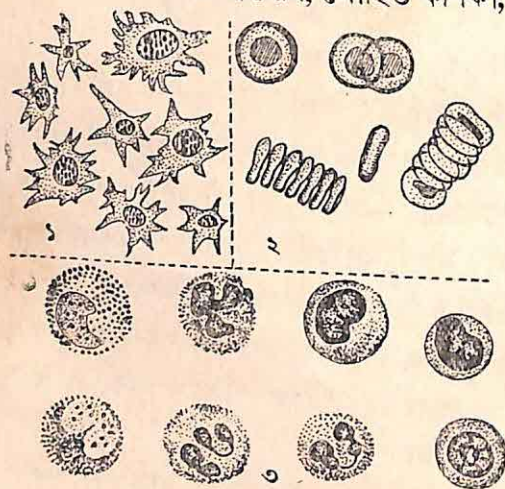
১—অনুচক্রিকা, ২—লোহিত কণিকা, ৩—শ্বেত কণিকা

ও **অনুচক্রিকা**। যে সব নাড়ীর দ্বারা শরীরের রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে রক্তবহা নাড়ী বলে। এই নাড়ী তিন প্রকার—(১) **ধমনী,** (২) **শিরা** ও (৩) **কৈশিক নাড়ী**।

আমাদের দেহের ভিতরে সর্বত্র হলুদ বর্ণের এক প্রকার সুতার জাল আছে; ইহার নাম **নার্ভ**। ইহারা **মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড** হইতে শরীরের সমস্ত যন্ত্রে ছড়াইয়া আছে। ইহাদিগকে সমষ্টিগত-ভাবে **নার্ভতন্ত্র** বলে। এই তন্ত্রের সাহায্যেই আমাদের দেহমনের প্রত্যেকটি গতি, অনুভূতি, চেষ্টা ও কার্য পরিচালিত হইতেছে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি কার্যের জন্য আমাদের শরীরে যে পদার্থ আছে তাহার নাম **মাংস** বা **পেশী**। পেশীগুলি সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে। পেশী দুই প্রকার: (১) **ঐচ্ছিক পেশী**—ইহারা আমাদের ইচ্ছায় চালিত হয় এবং (২) **অনৈচ্ছিক পেশী**—ইহারা আমাদের অজ্ঞাতসারে স্বাধীনভাবে কাজ করে। পেশীগুলি **মেদ** বা **চর্বি** দ্বারা আবৃত থাকে। চর্বির উপরে **ত্বক** বা **চর্ম** আছে। চর্মে অসংখ্য **লোমকূপ** নামক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রপথে শরীরের দূষিত পদার্থ ঘামরূপে বাহির হইয়া যায়। ত্বকের উপরে সমস্ত শরীরে **রোম** বা **কেশ** থাকে। আঙুলের প্রান্তের নখগুলি চর্মেরই রূপান্তর।

পরিপাক-তন্ত্র: ক্রমাগত কাজ করার ফলে আমাদের শরীর প্রত্যেক দিন কিছু কিছু করিয়া ক্ষয় হয়। খাদ্য হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া আমরা সেই ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকি। এই প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যবস্তু নানা প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তরল আকারে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া বিভিন্ন জীব-কোষে নীত হয় এবং শক্তি ও তাপ রক্ষা করে। এই প্রক্রিয়ায় দেহের যেসকল যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহাদের সমবেত নাম **পরিপাক-তন্ত্র**।

আমরা খাদ্যদ্রব্য প্রথমতঃ **মুখের** মধ্যে গ্রহণ করি এবং দাঁত ও জিহ্বার সাহায্যে সেইগুলিকে চর্বণ ও পেষণ করিয়া একটি নরম ডেলায় পরিণত করি। আমাদের মুখের ভিতরে তিন প্রকার গ্রন্থি আছে—(১) **প্যারটিড,** (২) **সাব-ম্যাক্সিলারি** ও (৩) **সাব-লিঙ্গুয়াল**। এই তিন রকমের গ্রন্থির রস মুখের ভিতরে আসিয়া

লালাগ্রন্থি
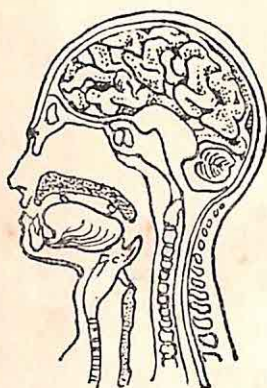
মুখগহ্বর

পড়ে। তাহাতে খাদ্যদ্রব্য নরম, আঠাল ও পিচ্ছিল হয়। এই রস বা লালার ভিতর **টায়ালিন** নামক এক প্রকার জারক রস থাকে। উহা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করে।

মুখ হইতে খাদ্য **গ্রাসনালীর** ভিতর দিয়া **পাকস্থলীতে** প্রবেশ করে। পাকস্থলীর প্রবেশপথটির নাম **আগম পথ**। পাকস্থলীর অভ্যন্তরভাগ বহু-ছিদ্র-যুক্ত একটি মৌচাকের মত। এই ছিদ্রগুলি

কতকগুলি পাচন গ্রন্থির নলের মুখ। এইগুলি হইতে পাচক রস নির্গত হইয়া খাদ্যদ্রব্যগুলিকে জীর্ণ করে। গ্রন্থিগুলি হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহাদের মধ্যে পেপ্‌সিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রধান এই রস প্রোটিন বা মাংস জাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া পেপ্‌টোনের সৃষ্টি করে। অম্লরস, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যকেও এই রস কতক পরিমাণে জীর্ণ করে এবং দুধকে ছানায় পরিণত করে। এই অর্ধজীর্ণ খাদ্যবস্তু পাকস্থলীর নিম্নদ্বার বা **নিগম পথ** দিয়া **ক্ষুদ্রান্ত্রের** ভিতরে যায়। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ একটি নল। ইহার প্রথম অংশের নাম **ডিওডিনাম** বা **গ্রহণী**। ইহা নল দ্বারা **যকৃৎ** ও **অগ্ন্যাশয়ের** সহিত যুক্ত। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় হইতে পাচক রস আসিয়া খাদ্যদ্রব্যকে জীর্ণ করে। যকৃতের পিত্তরসে স্নেহ জাতীয় পদার্থ জীর্ণ হয়। শর্করা জাতীয় খাদ্য হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া যকৃতে সঞ্চিত হয়। অগ্ন্যাশয়ের ইন্‌সুলিন নামক এক প্রকার রস চিনিকে সম্পূর্ণরূপে দহন করিয়া শরীরের তাপ রক্ষা করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে খাদ্যবস্তু
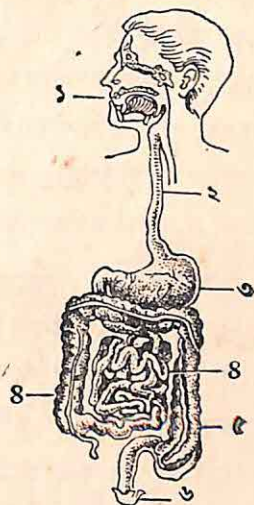
১—মুখ, ২—গ্রাসনালী, ৩—পাকস্থলী, ৪—ক্ষুদ্রান্ত্র, ৫—বৃহদন্ত্র, ৬—পায়ু
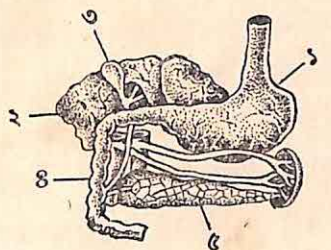
১—পাকস্থলী, ২—যকৃৎ, ৩—পিত্তস্থলী, ৪—গ্রহণী, ৫—অগ্ন্যাশয়

পাচক রসের সহিত সুন্দরভাবে মিলিয়া জীর্ণ হইতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত অনেকগুলি **শোষণযন্ত্র** আছে। তাহাদের ভিতর দিয়া জীর্ণ খাদ্যেররস শোষিত হইয়া রক্ত জালকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহের পুষ্টি সাধন করে। ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে খাদ্যবস্তু বৃহদন্ত্রে যায়। এখানে কোন পরিপাকের কার্য হয় না, কেবল খাদ্যের জলীয়াংশ এবং লবণ ও চিনি জাতীয় দ্রব্য শোষিত হয়। খাদ্যের বর্জনীয় পদার্থগুলি কঠিন মলরূপে বৃহদন্ত্রের ভিতর দিয়া গিয়া সময়মত মলভাণ্ডে সঞ্চিত থাকে এবং **পায়ুপথে** বাহির হয়।

শ্বাসতন্ত্রঃ প্রত্যেক প্রাণীই অবিরত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছে। যে সকল দেহযন্ত্রের সাহায্যে আমাদের এই শ্বাসকার্য চলে তাহাদের **সমবেত নাম শ্বাসতন্ত্র**। শ্বাসকার্যের জন্যই আমাদের বক্ষঃস্থল অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। শ্বাস গ্রহণের সময় বাহিরের বায়ু আমাদের ফুসফুসে যায় এবং শ্বাস ত্যাগের সময় ফুসফুস হইতে বায়ু বাহির হইয়া আসে।

প্রধানতঃ ছয়টি যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়— (১) নাসাপথ, (২) গলবিল, (৩) স্বরযন্ত্র, (৪) শ্বাসনালী, (৫) ফুসফুস ও (৬) মধ্যচ্ছদা।

(১) **নাসাপথ**ঃ—আমরা প্রধানতঃ নাক দিয়া প্রশ্বাস গ্রহণ করি। নাক বন্ধ থাকিলে মুখ দিয়াও শ্বাস লওয়া হয়। নাসাপথের সম্মুখের দিকে দুইটি ও পিছনের দিকে দুইটি দ্বার আছে। সম্মুখের দুইটি ছিদ্র দিয়া বায়ু নাকের ভিতর ঢোকে এবং পশ্চাতের দুইটি ছিদ্র দিয়া বাতাস গলবিলের মধ্যে যায়। নাসাপথে বায়ু গরম হয় ও ইহার ধূলাবালি নাসাপথের মধ্যবর্তী লোমে আটকাইয়া যায়। ধূলিময় শীতল বাতাস সহজে ফুসফুসের ভিতরে যাইতে পায় না।

(২) **গলবিল**ঃ—ইহা মাংসপেশী-নির্মিত একটি নল। ইহা শ্বাসনালী ও গ্রাসনালীর উর্ধ্বে ও নাসাপথের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত। ইহার দুই পার্শ্বে **তালুবিল** বা **টনসিল** নামে দুইটি গ্রন্থি আছে। মুখগহ্বরের উপরের দিকে তালুর পিছনে যে একটি ছোট মাংসপিণ্ড আছে তাহাকে **আলজিব** বলে। গলবিলের ভিতর দিয়া বায়ু নাক হইতে ফুসফুসে যায়।

(৩) **স্বরযন্ত্র**ঃ—গলবিলের নিম্নাংশে স্বরযন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের উপরে **অধিজিহ্বা** নামে একটি ঢাকনা আছে। খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় এই ঢাকনাটি বন্ধ হইয়া যায় ও শ্বাসকার্যের সময় ইহা খোলা থাকে।

(৪) **শ্বাসনালী**ঃ—স্বরযন্ত্রের পরেই শ্বাসনালী। এই শ্বাস-নালী কিছু নীচে নামিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই নালীর নাম **ব্রঙ্কাই**। ব্রঙ্কাই দুইটি ফুসফুসে গিয়া বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-থলিতে পরিণত হইয়াছে।
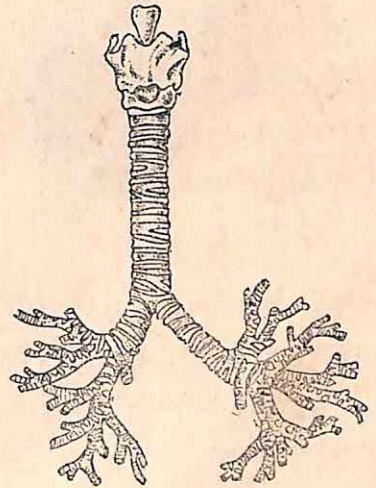
স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী, ব্রঙ্কাই

(৫) **ফুসফুস**ঃ—বুকের দুই পাশে দুইটি ফুসফুস আছে। দক্ষিণ ফুসফুস তিনটি খণ্ডে ও বাম ফুসফুস দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। ফুসফুসের চারিদিকে প্লুরা নামে একটি পাতলা রক্তস্রাবী আবরণ আছে। ফুসফুসের প্রত্যেক অংশে বায়ু-থলি এবং প্রত্যেক বায়ু-থলিতে

অসংখ্য বায়ুকোষ আছে। বায়ুকোষগুলির পাতলা আবরণে অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তজালক বিস্তৃত আছে। বায়ুকোষের বায়ু ও জালকের দূষিত রক্তের মধ্যে সহজে আদান-প্রদান চলে। প্রশ্বাস বায়ু প্রথমে নাসাপথ দিয়া প্রবেশ করে এবং শ্বাসনল ও ব্রঙ্কাই-এর ভিতর দিয়া ফুসফুসের বায়ু-কোষে উপস্থিত হয়। রক্ত যখন ফুসফুসের জালকের মধ্যে যায় তখন উহার হিমোগ্লোবিন বায়ুকোষের বায়ু হইতে অম্লজান শুষিয়া নেয় এবং কোষের ভিতর অঙ্গারাম্লত্যাগ করে। ইহার পর ফুসফুস সংকুচিত হইলে অঙ্গারাম্লযুক্ত দূষিত বায়ু নশ্বাসরূপে নাসাপথে বাহির হইয়া আসে।
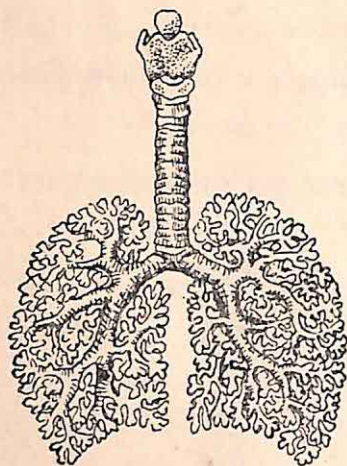
ফুসফুস

(৬) মধ্যচ্ছদা :—মধ্যচ্ছদা বুক ও পেটের মধ্যভাগে অবস্থিত মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত পর্দা-বিশেষ। ইহা একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত হইতেছে। এই পর্দা সংকুচিত হইলে ফুসফুস প্রসারিত হয় ও বাহিরের বায়ু নাসাপথ দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে মধ্যচ্ছদা প্রসারিত হইলে ফুসফুস সংকুচিত হয় এবং ভিতরের বায়ু নাসাপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

শ্বাসক্রিয়া : শ্বাস গ্রহণের জন্যই আমাদের বুক একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু ফুসফুসের মধ্যে যায় এবং নিশ্বাসের সহিত উহা পরিত্যক্ত হয়। শ্বাস গ্রহণের

করেন, কোন এক অতীতযুগে জীবকোষের মৌলিক উপাদানগুলির সমন্বয়ে প্রথম প্রাণময় জীবকোষের উৎপত্তি হইয়াছিল।

জীব ও জড়ের পার্থক্য ঃ জড়প্রকৃতি হইতে জীবের উদ্ভব হইয়াছে। অত্যন্ত নিম্নতম স্তরের জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। উচ্চ স্তরের জীবের এমন কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম আছে যে অনায়াসেই জড়পদার্থ হইতে উহাদের পৃথক করা যায়। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, জীব মাত্রেরই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, যে সকল লক্ষণ জড়পদার্থের নাই।

(১) **চঞ্চলতা** জীবনের একটি লক্ষণ। প্রাণী মাত্রই চঞ্চল। অধিকাংশ প্রাণীই ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে। উদ্ভিদ ছুটাছুটি করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ইহারা প্রয়োজনমত দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে চালনা করিতে পারে। কিন্তু জড়-পদার্থের কোন প্রকার **চঞ্চলতা** নাই। জড়পদার্থ নিজে কোন প্রকার গমনাগমন বা কোন অংশ কোন দিকে চালনা করিতে পারে না।

(২) জীবের **শ্বাসক্রিয়া** আছে। উদ্ভিদ, জলচর প্রাণী ও অন্য সকল প্রকার প্রাণীই প্রশ্বাসের সহিত অম্লজান গ্যাস গ্রহণ করে এবং নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস ত্যাগ করে। যে সব নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ফুলকা বা ফুসফুস নাই, তাহারা দেহের ত্বক ও বিভিন্ন রন্ধ্রের সাহায্যে এই কার্য করে। জড়দেহের **শ্বাসকার্য নাই**।

(৩) জীব মাত্রই **খাদ্য দ্বারা দেহ পুষ্ট করে**। দেহের পুষ্টি ছাড়া জীব বাঁচিতে পারে না। উদ্ভিদও বায়ু এবং মাটি হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহ পুষ্ট করে। কিন্তু জড়ের দেহে পুষ্টি নাই।

(৪) জীব **খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহের বৃদ্ধি** সাধন করে। জড়-দেহের **বৃদ্ধি নাই।**

(৫) জীব মাত্রই দেহের **দূষিত পদার্থ** নানা উপায়ে ত্যাগ **করিয়া থাকে।** কিন্তু জড়ের সেরূপ কোন কার্য নাই।

(৬) জীবদেহে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন ও উপাদান বিভিন্ন। জড়পদার্থের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে না।

(৭) আঘাত, আলোক, স্পর্শ, শৈত্য ও উত্তাপে জীবদেহে **উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা** দেয়। কুকুর, বিড়ালকে আঘাত করিলে চীৎকার করে। লজ্জাবতী লতা স্পর্শ করিলে সংকুচিত হয়। এইভাবে জীব **উত্তেজনার সাড়া দেয়।** জড়দেহে কোনরকম উত্তেজনা বা **উত্তেজনার চিহ্ন প্রকাশিত হয় না।**

(৮) প্রাণী মাত্রই ডিম্ব বা শাবক প্রসব করিয়া এবং উদ্ভিদেরা বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। জড়পদার্থের বংশবিস্তার নাই।

(৯) জীব **যখন যে অবস্থায় থাকে, তখন সেই অবস্থায় নিজেকে মানাইয়া লইয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে।** অবস্থা অনুযায়ী তাহার দেহ, আচার, আচরণ, আহার্য প্রভৃতি পরিবর্তিত করিয়া জীব অবস্থার অনুকূলে চলে। কিন্তু জড়বস্তুর **পারিপার্শ্বিকের সহিত মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা নাই।**

(১০) জীব মাত্রেরই **জন্ম এবং মৃত্যু আছে।** মৃত্যু হইলে জীবের দেহ জড়পদার্থে পরিণত হয়। জড়দেহ সর্বদাই প্রাণহীন ও চেতনাহীন। জড়ের জন্ম বা **মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।**

উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনা

উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একদিকে যেমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে, তেমনই আবার কতকগুলি পার্থক্যও দেখা যায়। এই সকল পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াই জীবকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—**উদ্ভিদ ও প্রাণী**।

সাদৃশ্যঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই দেহ কোষ দ্বারা গঠিত। জীবের একেবারে নিম্নস্তরে একদিকে যেমন একটিমাত্র কোষে গঠিত উদ্ভিদ আছে, তেমনই আবার একটিমাত্র কোষে গঠিত প্রাণীও আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই **জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে**। উভয়েই শ্বাসকার্য চালায়; বাতাসের **অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে**। শরীরের **বর্জনীয় পদার্থ** উভয়েই বিভিন্ন **উপায়ে বাহির করিয়া দেয়**; অথবা শরীরের কোন স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখে। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েরই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চেতনাশক্তি আছে বলিয়া উভয়েই বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

পার্থক্যঃ (১) উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য হিসাবে প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে উদ্ভিদ **অচল**। উহারা যেখানে জন্মে সেইখানেই খাদ্যদ্রব্য পাইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীই **গতিশীল**। উহারা খাদ্যের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। স্পঞ্জ ও প্রবাল প্রাণী হইলেও উহারা উদ্ভিদের মত অচল; আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র শেওলা উদ্ভিদ হইয়াও প্রাণীর মত জলে ঘুরিয়া আহার সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে এই প্রকার দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(২) উদ্ভিদদেহে কোন সামঞ্জস্য নাই; কিন্তু প্রাণীদেহে **সামঞ্জস্য** আছে।

(৩) উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। অধিকাংশ উদ্ভিদকোষের একটি প্রাচীর বা **আবরণ থাকে।** কিন্তু প্রাণীদের কোষে কোন প্রাচীর বা **আবরণ থাকে না।**

(৪) উদ্ভিদের বৃদ্ধি সাধারণতঃ **অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অগ্রভাগে** হয়, এবং উহারা **সারাজীবন নূতন নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে।** প্রাণীর **বৃদ্ধি অঙ্গের প্রান্তে আবদ্ধ থাকে না** এবং ইহাদের পরিপূর্ণ **বৃদ্ধি মৃত্যুর বহু আগেই সাধারণতঃ শেষ হইয়া যায়।**

(৫) অধিকাংশ স্থলেই উদ্ভিদের **গায়ের রং সবুজ** এবং এই সবুজ রঙের দ্বারা সূর্যের আলো হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বায়ুর অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও মাটির রস লইয়া উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে। **সবুজ রং বা ক্লোরোফিল ও আলো** ছাড়া সাধারণতঃ উহারা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। প্রাণীদের দেহে **সবুজ রং নাই।** সেজন্য তাহারা উদ্ভিদের মত **খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে না।**

(৬) উদ্ভিদ **কঠিন বস্তু** খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, কেবলমাত্র তরল পদার্থ হইতেই আহার্য সংগ্রহ করে। প্রাণীরা **তরল ও কঠিন** উভয় প্রকার পদার্থই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে।

(৭) উদ্ভিদ **ত্বকের ছিদ্র ও পাতার রন্ধ্র** দিয়া শ্বাসকার্য চালায়। প্রাণীরা **ফুসফুস, ফুলকা** প্রভৃতি যন্ত্র দিয়া শ্বাসকার্য চালায়।

(৮) উদ্ভিদ **বীজ** দিয়া অথবা দেহের কোন **অংশ পৃথক** করিয়া বংশবৃদ্ধি ও বংশবিস্তার করে। প্রাণী **সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের** ভিতর দিয়া বংশবৃদ্ধি ও বংশবিস্তার করে।

(৯) উদ্ভিদ জড়জগৎ **হইতে প্রত্যক্ষভাবে** খাদ্য সংগ্রহ করে।

প্রাণীরা **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে** উদ্ভিদের দেহ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

(১০) উদ্ভিদের চক্ষু, কর্ণ, ফুসফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতি **দেহযন্ত্র নাই**। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর এই সব যন্ত্র আছে। উদ্ভিদের **বুদ্ধিশক্তি নাই** এবং **শব্দ করিতে পারে না**, কিন্তু উচ্চস্তরের প্রাণীদের **বুদ্ধিশক্তি আছে** এবং তাহারা **শব্দ করিতে পারে**।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণী-বিভাগ

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগঃ এই পৃথিবীতে নানা প্রকার উদ্ভিদ আছে। কতকগুলি উদ্ভিদের ফুল ও বীজ হয়, যেমন—ছোলা, মটর, শিম, আম, জাম, কলা ইত্যাদি ; আবার কতকগুলি উদ্ভিদের ফুল হয়, বীজ হয় না, যেমন—শেওলা, ফার্ণ, মস ইত্যাদি। যে সব উদ্ভিদের ফুল ও বীজ হয়, তাহাদিগকে **সবীজ** উদ্ভিদ বলে ; আর যে সকল উদ্ভিদের বীজ হয় না, তাহাদিগকে **অবীজ** উদ্ভিদ বলা হয়।

সবীজ উদ্ভিদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকার সবীজ উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড এবং শিকড় থাকে। বড় হইলে ইহাদের ফুল, ফল ও বীজ হয়। এই প্রকার বীজধারী উদ্ভিদকে **আবৃতবীজ** উদ্ভিদ বলে।

অন্য প্রকার সবীজ গাছের বীজ একপ্রকার বিশেষ প্রকৃতির পাতার উপর অনাবৃত ভাবে জন্মে। পাইন গাছ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগকে **নগ্নবীজ** উদ্ভিদ বলে।

আবৃতবীজ উদ্ভিদকে বীজপত্রের সংখ্যা হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—**একদল-বীজ** বা **একবীজপত্রী** ও **দ্বিদল-বীজ** বা

দ্বিবীজপত্রী। ধান, নারিকেল, যব ইত্যাদি একদল-বীজ উদ্ভিদ। আর মটর, ছোলা, জাম ইত্যাদি দ্বিদল-বীজ উদ্ভিদ।

অবীজ উদ্ভিদদিগের সাধারণতঃ তিনটি ভাগ দেখা যায়। (১) শেওলা, ছত্রক বা ব্যাঙের ছাতার মত উদ্ভিদে শিকড়, কাণ্ড ও পাতা ইত্যাদি কিছু থাকে না। ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন রকম বৈশিষ্ট্য না থাকায় ইহা-দিগকে **সমাঙ্গী** উদ্ভিদ বলা হয়। ইহারাই সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ। (২) বর্ষাকালে ভিজা দেওয়ালের গায়ে সবুজ রঙের কার্পেটের মত যে একপ্রকার উদ্ভিদ দেখা যায়, তাহাদিগকে **মস** বলে। ইহাদের কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু শিকড় নাই। অবীজ উদ্ভিদের এই শ্রেণীকে **মসবর্গীয়** উদ্ভিদ বলে। (৩) অবীজ উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা উন্নত, তাহাদের পাতা, কাণ্ড ও শিকড় থাকে কিন্তু ফুল ও বীজ হয় না। ইহাদিগকে **ফার্ণবর্গীয়** উদ্ভিদ বলা হয়। ফার্ণ, ঢেঁকিশাক সুষনি প্রভৃতি এই বর্গের অন্তর্গত।
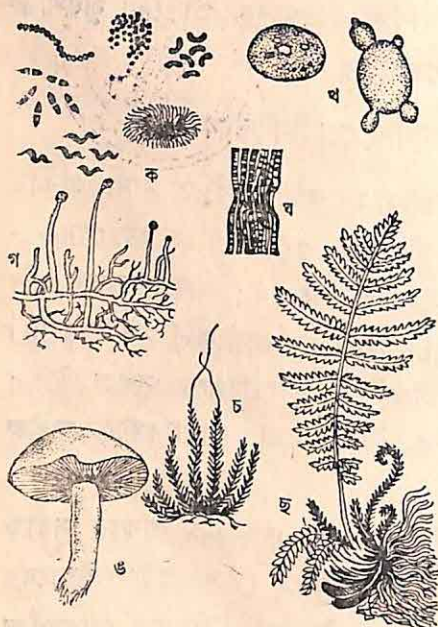
অপুষ্পক উদ্ভিদ

ক—বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটিরিয়া, খ—ঈস্ট, গ—ছত্রক, ঘ—শেওলা, ঙ—ব্যাঙের ছাতা, চ—মস, ছ—ঢেঁকিশাক
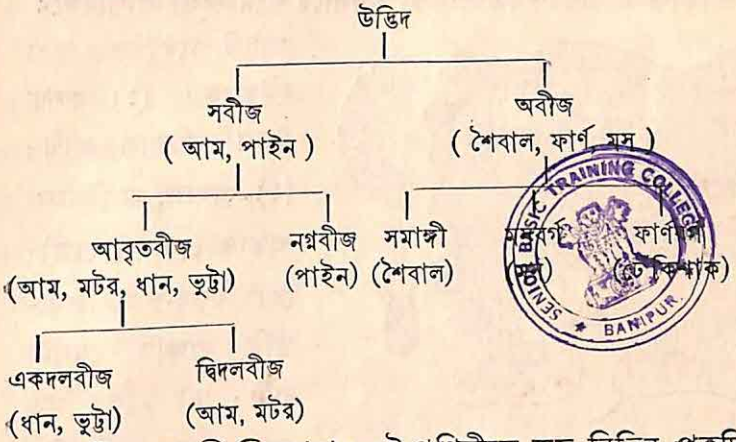
প্রাণীর শ্রেণী-বিভাগ : এই পৃথিবীতে কত বিভিন্ন প্রকৃতির বিচিত্র গঠনের প্রাণী আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাণিজগতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাণীর শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। প্রাণীজগতে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দুইটি ভাগ দেখা যায়—(১) **এককোষী প্রাণী**, (২) **বহুকোষী প্রাণী**। এককোষী প্রাণীর দেহে একটি মাত্র কোষ থাকে এবং উহা ঐ একটিমাত্র কোষ দ্বারা জীবনের সমস্ত কাজ করিতে পারে। এই প্রকার প্রাণীকে **প্রোটোজোআ** (Protozoa) বা **আদ্যপ্রাণী** বলা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহা-দের দেখা যায় না। বহুকোষী প্রাণীর দেহে অনেক কোষ থাকে। ইহাদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। (১) যে সমস্ত প্রাণীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নাই তাহাদের **অমেরুদণ্ডী** প্রাণী বলে ; যেমন মৌমাছি, চিংড়ি, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি। (২) আর যাহাদের শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড আছে তাহাদের **মেরুদণ্ডী** প্রাণী বলে ; যেমন—মাছ, ব্যাঙ, শাপ, কুমীর, পাখী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি।

আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে আটটি পর্বে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) **স্পঞ্জ** ইত্যাদি **ছিদ্রাল** প্রাণী; (২) প্রবাল, জেলিফিশ প্রভৃতি **একনালী-দেহী**; (৩) যকৃৎ-কৃমি, ফিতা-কৃমি প্রভৃতি **চেপটা কৃমি**; (৪) নলের মত গোলাকার **সূতা-কৃমি**;
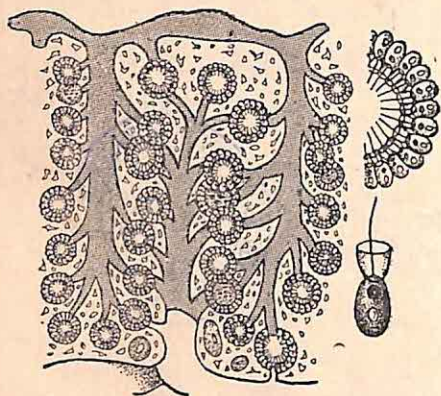
স্পঞ্জ

(৫) কেঁচো, জেঁাক প্রভৃতি **অঙ্গুরীমাল** প্রাণী—ইহাদের দেহ গোল গোল অঙ্গুরীর মত পেশী দ্বারা গঠিত; (৬) সমুদ্র-শসা, তারা-মাছ প্রভৃতি **কণ্টকত্বক** প্রাণী; (৭) চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি **সন্ধিপদ** প্রাণী;

প্রবাল কীট

(৮) শামুক, গেঁড়ি, শঙ্খ, কড়ি প্রভৃতি **শম্বূক-জাতীয়** প্রাণী।
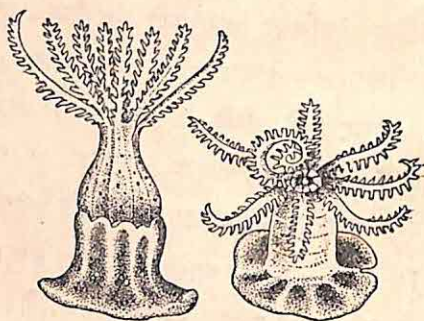
মেরুদণ্ডী শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কতিপয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদিগের শিরদাঁড়া নাই; তৎপরিবর্তে নোটকর্ড আছে। উহাদের মাথার খুলি নাই বলিয়া উহাদিগকে **করোটি-বিহীন** প্রাণী বলা হয়। **করোটি-বিশিষ্ট** প্রাণী পাঁচ প্রকারের। ইহাদের ভিতর দুই প্রকার

প্রাণী **উষ্ণ-রক্ত-বিশিষ্ট** এবং অবশিষ্ট তিন প্রকার **শীতল-রক্ত-বিশিষ্ট**।

(১) **মাছ,** (২) **উভয়চর,** ও (৩) **সরীসৃপ** শীতল-রক্ত-বিশিষ্ট। মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাস লয় ও পাখনার সাহায্যে চলে। ব্যাঙ প্রভৃতি উভচর প্রাণী শৈশবে ফুলকা ও পরিণত বয়সে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, কুমীর প্রভৃতি সরীসৃপ শৈশব হইতেই ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস লয় ; ইহাদের দেহে আঁশ থাকে।

(১) **পক্ষী** ও (২) **স্তন্যপায়ী** উষ্ণ-রক্ত-বিশিষ্ট। পাখির দেহ পালক দিয়া আবৃত থাকে এবং ইহার উড়িবার জন্য ডানা আছে। স্তন্যপায়ীরা শৈশবে **স্তন্যপান** করে এবং ইহাদের দেহে অল্পাধিক লোম থাকে।

প্রাণীর শ্রেণী-বিভাগ

মটর গাছ পর্যবেক্ষণ

মটরঃ মটর এক প্রকার রবিশস্য। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সাধারণতঃ এই ফসল সংগ্রহ করা হয়। মটর বীজ হইতেই মটরের ডাইল পাওয়া যায়। মটরশুঁটি ফল এবং মটরগুলি সেই ফলের বীজ।

মটর বীজের গঠনঃ মটর বীজ দেখিতে গোল। উহার একটি ফিকা হলুদ বর্ণের পাতলা আবরণ আছে। এই পাতলা

মটর বীজের গঠন

আবরণটিকে **খোসা** বলে। খোসার উপরে ছোট একটি সাদা দাগ দেখা যায়। এই দাগটিতেই বীজটি ফলের সহিত যুক্ত ছিল। ইহার নাম **ডিম্বক নাভি**। ডিম্বক নাভির উপরে ছোট আর একটি ছিদ্র আছে ; সেই ছিদ্রটিকে **ডিম্বক রন্ধ্র** বলে।

ভালভাবে পরীক্ষার জন্য কয়েকটি মটর রাত্রে ভিজাইয়া রাখিলে পরদিন প্রাতে দেখিবার সুবিধা হয়। নখ দিয়া মটরের খোসা তুলিয়া ফেলিলে খোসার ভিতরে একটি গোল বস্তু দেখা যায়। ইহা মটরের **ভ্রূণ** বা **উদ্ভিদ-শিশু**। জলে ভিজা মটরের ভ্রূণটি চাপ দিলে দুইখণ্ডে ভাগ হইয়া যায়। খণ্ড দুইটিকে **বীজপত্র** বলে। খণ্ড দুইটি কব্জার মত একটি ছোট দণ্ডের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই দণ্ডটিকে **বীজদণ্ড** বা **ভ্রূণদণ্ড** বলে। বীজপত্র এবং বীজদণ্ড লইয়াই **ভ্রূণ** বা **উদ্ভিদ-শিশু**

গঠিত। ভ্রূণের তিনটি প্রত্যঙ্গ। বাহিরের দিকের অগ্রভাগের নাম **ভ্রূণমূল**। ভিতরের দিকের অগ্রভাগটিকে বলে **ভ্রূণমুকুল,** আর বড় মোটা দুইখণ্ড শাঁসের নাম **বীজদল** বা **বীজপত্র**। এইভাবে মটরের বীজটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উদ্ভিদ হিসাবে মটর **সবীজ**; বীজটি পাতলা আবরণে ঢাকা থাকে; সুতরাং ইহা **আবৃতবীজ**। ইহার দুইটি বীজদল আছে; তজ্জন্য ইহা দ্বিদল-বীজ শ্রেণীর অন্তর্গত।

মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গমঃ একটি পাত্রে কিছু মাটি বা কাঠের গুঁড়া দিয়া তাহাতে কয়েকটি ভিজা মটর বীজ পুঁতিয়া উপযুক্ত পরিমাণে জল দিলে দুই-তিন দিন পরে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি বীজের খোসা ডিম্বক রন্ধ্রের কাছে ফাটিয়া গিয়াছে ও ফাটা জায়গার ফাঁক দিয়া ভ্রূণমূলটি বাহিরের দিকে আসিতেছে। যে ভাবেই বাহির হউক ভ্রূণমূলটি বাঁকিয়া নীচের দিকে গিয়া মাটিতে প্রবেশ করিবে। ভ্রূণমূলটিই মাটির ভিতর ক্রমশঃ বড় হইয়া একটি লম্বা শিকড়ে পরিণত হয়। পরে ঐ শিকড়ের গা হইতে কতকগুলি ছোট ছোট শাখা-শিকড় গজায়। এদিকে ধীরে

মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গম

মটর গাছ পর্যবেক্ষণ

মটরঃ মটর এক প্রকার রবিশস্য। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সাধারণতঃ এই ফসল সংগ্রহ করা হয়। মটর বীজ হইতেই মটরের ডাইল পাওয়া যায়। মটরশুঁটি ফল এবং মটরগুলি সেই ফলের বীজ।

মটর বীজের গঠনঃ মটর বীজ দেখিতে গোল। উহার একটি ফিকা হলুদ বর্ণের পাতলা আবরণ আছে। এই পাতলা

মটর বীজের গঠন

আবরণটিকে **খোসা** বলে। খোসার উপরে ছোট একটি সাদা দাগ দেখা যায়। এই দাগটিতেই বীজটি ফলের সহিত যুক্ত ছিল। ইহার নাম **ডিম্বক নাভি**। ডিম্বক নাভির উপরে ছোট আর একটি ছিদ্র আছে ; সেই ছিদ্রটিকে **ডিম্বক রন্ধ্র** বলে।

ভালভাবে পরীক্ষার জন্য কয়েকটি মটর রাত্রে ভিজাইয়া রাখিলে পরদিন প্রাতে দেখিবার সুবিধা হয়। নখ দিয়া মটরের খোসা তুলিয়া ফেলিলে খোসার ভিতরে একটি গোল বস্তু দেখা যায়। ইহা মটরের **ভ্রূণ** বা **উদ্ভিদ-শিশু**। জলে ভিজা মটরের ভ্রূণটি চাপ দিলে দুইখণ্ডে ভাগ হইয়া যায়। খণ্ড দুইটিকে **বীজপত্র** বলে। খণ্ড দুইটি কব্জার মত একটি ছোট দণ্ডের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই দণ্ডটিকে **বীজদণ্ড** বা **ভ্রূণদণ্ড** বলে। বীজপত্র এবং বীজদণ্ড লইয়াই **ভ্রূণ** বা উদ্ভিদ-শিশু

গঠিত। ভ্রূণের তিনটি প্রত্যঙ্গ। বাহিরের দিকের অগ্রভাগের নাম **ভ্রূণমূল**। ভিতরের দিকের অগ্রভাগটিকে বলে **ভ্রূণমুকুল**, আর বড় মোটা দুইখণ্ড শাঁসের নাম **বীজদল** বা **বীজপত্র**। এইভাবে মটরের বীজটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উদ্ভিদ হিসাবে মটর **সবীজ**; বীজটি পাতলা আবরণে ঢাকা থাকে; সুতরাং ইহা **আবৃতবীজ**। ইহার দুইটি বীজদল আছে; তজ্জন্য ইহা দ্বিদল-বীজ শ্রেণীর অন্তর্গত।

মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গমঃ একটি পাত্রে কিছু মাটি বা কাঠের গুঁড়া দিয়া তাহাতে কয়েকটি ভিজা মটর বীজ পুঁতিয়া উপযুক্ত পরিমাণে জল দিলে দুই-তিন দিন পরে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি বীজের খোসা ডিম্বক রন্ধ্রের কাছে ফাটিয়া গিয়াছে ও ফাটা জায়গার ফাঁক দিয়া ভ্রূণমূলটি বাহিরের দিকে আসিতেছে। যে ভাবেই বাহির হউক ভ্রূণমূলটি বাঁকিয়া নীচের দিকে গিয়া মাটিতে প্রবেশ করিবে। ভ্রূণমূলটিই মাটির ভিতর ক্রমশঃ বড় হইয়া একটি লম্বা শিকড়ে পরিণত হয়। পরে ঐ শিকড়ের গা হইতে কতকগুলি ছোট ছোট শাখা-শিকড় গজায়। এদিকে ধীরে

মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গম

ধীরে ভ্রূণমুকুল বড় হইয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে এবং অবশেষে উহা কাণ্ডে পরিণত হয় এবং উহার উপরে পাতা গজায়। এই সময়ে বীজদল দুইটি পাতলা হইয়া খসিয়া পড়ে। এই বীজদল কখনও খোসার বাহিরে আসে না; উহা সর্বদা মাটির নীচেই থাকে।

কাণ্ড
শাখামূল
মূলত্রাণ
প্রধান মূল
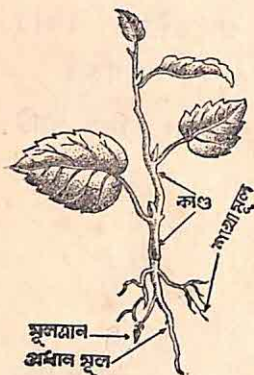
মূলের কাজঃ গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণমূলটি বড় হইয়া শিকর বা মূলে পরিণত হয়। ছোলা, মটর প্রভৃতি দ্বিদল-বীজ অঙ্কুরিত হইলে ভ্রূণমূল বাড়িয়া যে লম্বা মূল হয় তাহার নাম **প্রধান মূল**। প্রধান মূল হইতে আবার ছোট ছোট কতকগুলি **শাখামূল** বাহির হইয়া থাকে। এইভাবে মূলের শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয়। গাছকে মাটির উপর আটকাইয়া রাখাই ইহাদের কাজ। মূলের অন্যতম কাজ মাটি হইতে **রস শোষণ করা**। প্রত্যেক মূলের এবং মূলের শাখা-প্রশাখার আগায় একটি টুপির মত ঢাকনি আছে। ইহাকে **মূলত্রাণ** বলে। মূলত্রাণ আছে বলিয়াই কঠিন মাটি ভেদ করিবার সময় মূলের আগায় কোন আঘাত লাগে না।
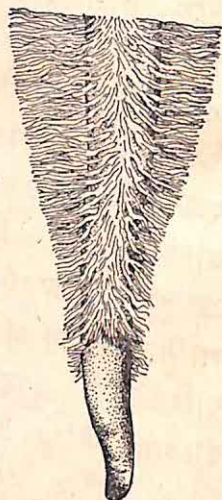
মূলরোম

প্রত্যেক মূলেই মূলত্রাণের পশ্চাতে মূলের উপর কতকগুলি খুব ছোট ছোট রোম থাকে। উহাদিগকে **মূলরোম** বলে। গাছ মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে রস শোষণ করে।

উপরি উক্ত দুইটি কাজ ছাড়া কোন কোন মূল অবস্থা-বিশেষে খাদ্য সঞ্চয় করে ; যেমন—মূলা, শালগম, গাজর ইত্যাদি। কোন কোন মূল কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার ভার বহন করে ; যেমন—বটের ঝুরি। ইহা ছাড়া সুন্দরী গাছের মূল শ্বাসকার্য চালায় ও বহু জলজ উদ্ভিদের মূল উহাদিগকে জলে ভাসিতে সাহায্য করে।

কাণ্ডের কাজঃ কাণ্ডের কাজ অনেকটা মানুষের দেহের মত। কাণ্ড হইতেই গাছের শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয়। কাণ্ডের যে অংশ হইতে পাতা বাহির হয়, তাহাকে **পর্বসন্ধি** বলে। দুইটি পর্বের মাঝখানের অংশকে **পর্বমধ্য** বলা হয়। পাতা ও পর্বসন্ধির সংযোগস্থলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **কক্ষ** বলে। প্রত্যেক কক্ষে একটি করিয়া কুড়ি থাকে। ইহাদিগকে **কক্ষমুকুল** বলা হয়। কাণ্ডের আগাতেও মুকুল আছে। তাহার নাম **মাথার মুকুল**।

কাণ্ডের বিভিন্ন অংশঃ কাণ্ড নানা প্রকারের হইতে পারে। মটর গাছের কাণ্ড কোমল তাই মটর গাছ অবলম্বন ছাড়া উপরের দিকে উঠিতে পারে না। আম, জাম প্রভৃতি গাছের কাণ্ড শক্ত বলিয়া ঐ সব গাছ মাটির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

কাণ্ড প্রধানতঃ তিনটি কাজ করে। ইহা (১) পাতা, ফুল ফল ধারণ করে ; (২) মূলরোম দিয়া মাটি হইতে সংগৃহীত রসকে পাতায় চালনা করে এবং (৩) পাতায় প্রস্তুত খাদ্যকে গাছের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। এই তিনটি কাজ ছাড়া অবস্থা-বিশেষে কাণ্ড আরও নানা প্রকার কাজ করে ; যেমন—মটর গাছের কাণ্ড আকর্ষে রূপান্তরিত হইয়া লতাকে উপরের দিকে উঠিতে সাহায্য করে। কোনও কোনও গাছের কাণ্ড পাতার মত শ্বাসকার্য চালায় ও খাদ্য প্রস্তুত করে ; যেমন—ফণী মনসা।

পাতার কাজঃ কাণ্ডের পর্বসন্ধি হইতে পাতা বাহির হয় এবং প্রত্যেক পাতার কক্ষে মুকুল থাকে। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাতার কোলের মুকুল হইতে শাখা-প্রশাখা জন্মায়। মটর গাছের পাতার গোড়ায় দুইটি বড় **উপপত্র** থাকে। উপপত্র দেখিতে সবুজ, চওড়া ও পাতলা। উপপত্রগুলিও পাতার মতই কাজ করিয়া থাকে। উপপত্রের কোল হইতে পাতার বৃন্ত বাহির হয়। বৃন্তের দুই পার্শ্বে দুই-তিন জোড়া অনুফলক থাকে। বৃন্তের শেষের দিকের কয়েকটি অনুফলক আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। আকর্ষের সাহায্যে গাছ অবলম্বন আশ্রয় করে। সকল গাছের পাতাই সাধারণতঃ তিনটি কাজ করে—(১) শ্বাসকার্য, (২) অঙ্গার আত্মীকরণ ও (৩) প্রস্বেদন।

পাতার শ্বাসকার্যঃ গাছ পাতা দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। গাছেরপাতার নীচের দিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র বা স্টোমা আছে। খালি চোখে ঐগুলি দেখা যায় না। ঐ ছিদ্রগুলি দিয়াই গাছ শ্বাসকার্য চালায়। শ্বাসকার্যের অভাবে গাছও প্রাণীর মতই মরিয়া যায়।

পাতার স্টোমা
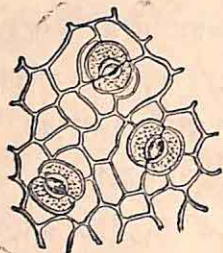
পাতার অঙ্গার-আত্মীকরণঃ সকল জীবের শরীর গঠনের জন্যই অঙ্গারের প্রয়োজন হয়। গাছ এই অঙ্গার বায়ুর অঙ্গারাম্ল হইতে গ্রহণ করে। পাতার ছিদ্র দিয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাস পাতায় প্রবেশ করে। অপর দিকে মাটি হইতে শোষিত রস কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় আসে। পাতায় সবুজকণা ও সূর্যকিরণের সাহায্যে জল ও অঙ্গারাম্লের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। ইহার ফলে গাছের খাদ্য শর্করা প্রস্তুত হয়। এই শর্করা দেহের বিভিন্ন অংশে চালিত হইয়া জীবকোষগুলিকে খাদ্য যোগায়।

পাতার প্রস্বেদন ঃ গাছ মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে তরল খনিজ পদার্থের দ্রবণ শোষণ করে। ইহাতে গাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হয়। গাছ প্রয়োজনমত জল রাখিয়া অবশিষ্ট জল পাতার রন্ধ্র দিয়া বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়।

পাতার প্রস্বেদন

ফুলের কাজ ঃ গাছ বড় হইলে যথাসময়ে উহাতে ফুল ধরে। মটর গাছও কিছু বড় হইলেই উহাতে ফুল ধরে। কখনও হয়তো পাতার কোলে একটি করিয়া ফুল ফোটে। কখনও বা কোন পাতার কোলে একটি দণ্ডের গায়ে দুই-তিনটি ফুল হয়। প্রত্যেক ফুলেরই একটি ছোট বোঁটা আছে। ফুলে পাঁচটি বৃতি ও পাঁচটি বৃত্যংশ আছে; বৃত্যংশগুলি পরস্পর দাঁতের মত জোড়া। বৃতির মধ্যে দলটি দেখিতে প্রজাপতির মত। পাপড়িগুলি সাধারণতঃ সাদা রঙের এবং সংখ্যায় পাঁচটি। একটি পাপড়ি অপর সব পাপড়ি হইতে বড়। কুঁড়ি অবস্থায় ইহাই অন্য সবগুলিকে ঢাকিয়া রাখে। এই বড় পাপড়িটিকে **ধ্বজা** বলা হয়। ইহার মাঝের দুইটি পাপড়িকে **পক্ষ** বলে। পক্ষের ভিতরে দুই পাশে আরও দুইটি পাপড়ি আছে, তাহাদের নাম নৌকা। ফুলের দলের
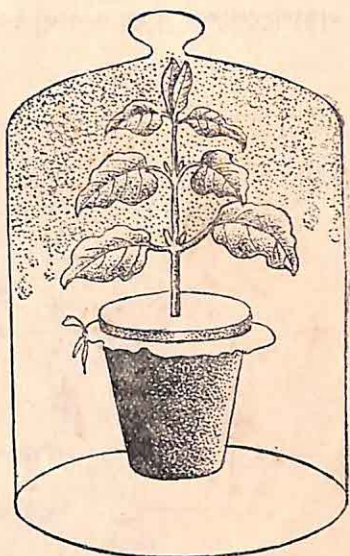
ভিতর পুংকেশর চক্রে দশটি **পুংকেশর সূত্র** আছে। উহাদের মধ্যে নয়টি একত্র হইয়া **গর্ভকেশর চক্রের** কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখে; একটি পৃথক ভাবে বাহিরে থাকে। প্রত্যেক পুংকেশরের মাথায় **পরাগকোষের** মধ্যে অসংখ্য **পরাগরেণু** আছে। এদিকে ফুলের ঠিক
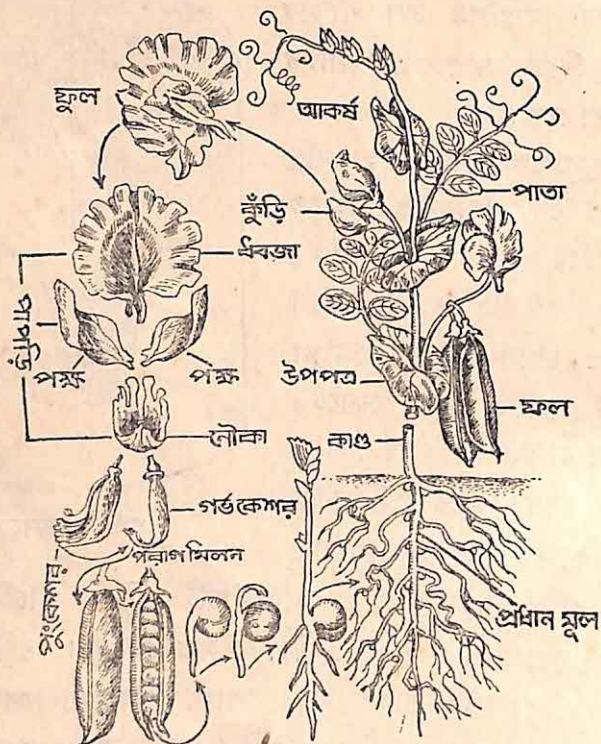
মটর গাছের জীবন

মাঝখানে একটিমাত্র গর্ভকেশর দিয়া গঠিত গর্ভকেশর চক্র। গর্ভ-কোষটি দেখিতে লম্বা ও চেপটা। গর্ভকোষের ভিতরে সারি সারি

সময় বুকের পেশী ও মধ্যচ্ছদার সংকোচন হয় ও সংকোচনের জন্য মধ্যচ্ছদা নামিয়া পড়ে, ইহার ফলে ফুসফুসের বায়ুর চাপ কমিয়া যায় এবং বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করিবার জন্য বাহিরের বায়ু নাসাপথ দিয়া ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুকোষ এবং জালকের মাধ্যমে অম্লজান ও অঙ্গারাম্লের আদান-প্রদান চলে। নিশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছদা ও পাঁজরার পেশীগুলি প্রসারিত হইতে থাকে এবং বুকের গহ্বরের আয়তন কমিয়া আসে। ফলে ফুসফুসে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্গারাম্ল ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু নাসাপথ দিয়া বাহির হইয়া আসে।

রেচনতন্ত্রঃ যে সকল দেহযন্ত্রের সমবেত কার্যের ফলে শরীর হইতে সমস্ত বর্জনীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়, তাহাদের নাম রেচনতন্ত্র। শরীরের দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বাহির হইয়া না
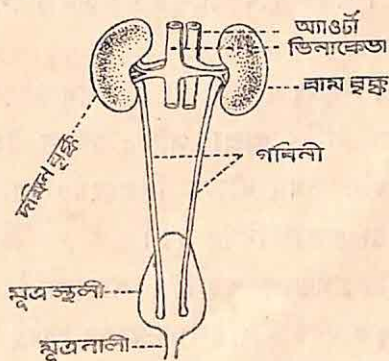
গেলে আমাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। রেচনতন্ত্রের যন্ত্রগুলির নাম (১) বৃক্ক বা কিডনি, (২) গবিনী বা ইউরেটর, (৩) মূত্রস্থলী বা ইউরিনারী ব্লাডার ও (৪) মূত্রনালী বা ইউরেথ্রা।

(১) **বৃক্ক** :—বৃক্ক দেখিতে শিমের বীজের মত এবং ইহার আয়তন বদ্ধমুষ্টির সমান। মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুইটি বৃক্ক থাকে। ইহারা চর্বির স্তর দ্বারা আবৃত থাকে। পৃষ্ঠের সহিত পেশী বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া ইহারা স্বস্থানে থাকিতে পারে। রক্তস্রোতের অধিকাংশই বৃক্কের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। বৃক্ক রক্ত হইতে দূষিত বর্জনীয় পদার্থ টানিয়া লয়।

(২) **গবিনী** :—বৃক্ক হইতে যে দুইটি নল নীচের দিকে টানিয়া মূত্রস্থলীতে গিয়াছে, উহাদের নাম গবিনী বা ইউরেটার। ইহাদের ভিতর দিয়া রক্তের দূষিত বর্জনীয় পদার্থ বৃক্ক হইতে মূত্রস্থলীতে চালিত হয়।

(৩) **মূত্রস্থলী** :—মূত্রস্থলী পেশীময় তন্তু দ্বারা গঠিত। ইহাতে প্রায় একপোয়া জলীয় পদার্থ থাকিতে পারে। ইহার নীচের দিকে একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্রের মুখে আংটির মত একটি পেশী আটকান আছে।

(৪) **মূত্রনালী** :—মূত্রস্থলীর নীচের ছিদ্রপথ হইতে মূত্রনালীর আরম্ভ। মূত্রস্থলীতে অধিক প্রস্রাব সঞ্চিত হইলে উহার পেশীময় প্রাচীর সংকুচিত হয়, তখন নীচের ছিদ্রমুখের আংটিটি খুলিয়া যায় ও মূত্রনালী দিয়া প্রস্রাব নির্গত হয়।

রেচনতন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রাদির সাহায্যেও দেহাভ্যন্তরস্থ বর্জনীয় পদার্থ দূরীভূত হয়। পরিপাক-তন্ত্রের বৃহদন্ত্র জীর্ণ খাদ্যবস্তু হইতে জলীয় ভাগ শোষণ করিয়া বর্জনীয় পদার্থ মলরূপে নিঃসরণ করে। ফুসফুস নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস ত্যাগ করে। চর্মের নীচে ঘর্মগ্রন্থি অবস্থিত। ঘর্মগ্রন্থিগুলি ঘর্মের মধ্য দিয়া বহু দূষিত পদার্থ দূর করে।

কয়েকটি সাধারণ রোগ

ম্যালেরিয়া ঃ ম্যালেরিয়া কথাটি আমাদের খুবই পরিচিত। কথাটি ইতালীয়। ইহার অর্থ দূষিত বায়ু। পূর্বে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, জলাভূমি হইতে রাত্রিবেলা দূষিত বায়ু উত্থিত হইয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি করে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তার **সার্ রোনাল্ড রস** প্রমাণ করেন যে মশা ম্যালেরিয়া নামক রোগের জীবাণু-বাহক। কিন্তু সেই ম্যালেরিয়া পাখির শরীরেই মশা দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। পরে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক **গ্রাসী** প্রমাণ করেন যে মশা মানুষের দেহেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে।
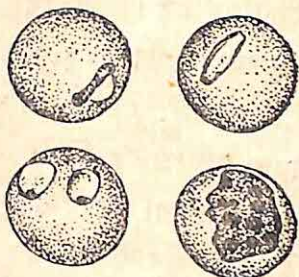
রক্তের লাল কণিকায়
ম্যালেরিয়ার জীবাণু
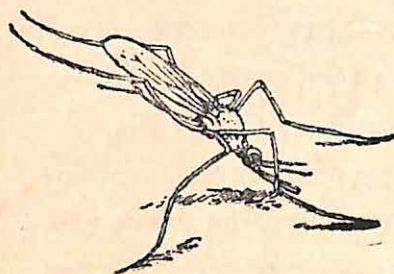
যে জীবাণুর জন্য ম্যালেরিয়া হয় তাহার নাম **প্লাজমোডিয়াম**। ইহারা এককোষী প্রাণী। অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশা ইহার বাহক। প্লাজমোডিয়াম জীবাণু মানুষের রক্তের লাল কণিকায় এবং অ্যানোফিলিস স্ত্রী মশার লালাগ্রন্থিতে থাকিতে পারে।

অ্যানোফিলিস

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা যখন হুল ফুটাইয়া ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শুষিয়া লয়, তখন সেই রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়াব জীবাণু

মশার পেটে ঢুকিয়া পাকস্থলীর গায়ে আশ্রয় লয় ও সেখানে থাকিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। পরে উহারা মশার লালাগ্রন্থিতে আশ্রয় নেয়। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা রক্ত শুষিয়া লইবার পর লালাগ্রন্থি হইতে কিছু লালা বাহির করিয়া রক্তে মিশাইয়া দেয়। ইহাতেই উহার লালাগ্রন্থির প্লাজ্‌মোডিয়াম জীবাণু মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়। মানুষের রক্তে আসিয়া জীবাণুগুলি প্রথমে যকৃতে স্থান লয়। তাহার পর একটি বিভক্ত হইয়া দুইটি, দুইটি বিভক্ত হইয়া চারিটি, এইরূপে সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। যখন এই সকল জীবাণু রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয় তখন কম্প দিয়া জ্বর আসে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ :—সহসা কম্প দিয়া জ্বর আসে, পিত্ত বমি হয় ও খুব শীত করে। কয়েক ঘণ্টা পরে প্রচুর ঘর্ম হয় ও জ্বর ছাড়িয়া যায়। এইরূপে প্রতিদিন, বা দুই-এক দিন অন্তর জ্বর হয়। রোগী প্রায় বর্ষারম্ভ হইতে শীতকাল পর্যন্ত জ্বরে ভুগিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা :—কুইনীন ম্যালেরিয়ার সর্বপ্রধান ঔষধ। আজকাল পালুড্রিন, এটেব্রিন প্রভৃতি নানা ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায় :—ম্যালেরিয়া রোগী ও মশকীর একত্র সমাবেশ হইলেই ম্যালেরিয়া বিস্তৃতিলাভ করে। তজ্জন্য ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিতে হইলে, সুচিকিৎসা দ্বারা রোগী-দিগকে সুস্থ করিতে হইবে, মশকী যাহাতে দংশন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং মশকীদিগের ধ্বংসসাধন করিতে হইবে। মশা কমাইতে হইলে ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জলা, ডোবা বুজাইয়া মশার জন্মস্থান ও বাসস্থানগুলি নষ্ট করিয়া দিতে হয়। ডোবার জলে কেরোসিন তৈল ছড়াইয়া দিলে মশার বংশ-বৃদ্ধি বন্ধ হয়। জলের উপর তৈল থাকিলে মশার বাচ্চাগুলি শ্বাস

লইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। ঘরে ডি. ডি. টি. কিংবা ফ্লিট দিলে মশা মরিয়া যায়। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিবার জন্য মশার কামড়ের হাত এড়াইতে হইলে মশারি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ম্যালেরিয়া রোগে কুইনাইন সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কুইনীন সেবনে বা ইন্‌জেকশনে রোগীর উপকার হয়। কোন স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইলে সেখানে প্রত্যেকের সপ্তাহে পাঁচ কিংবা দশ গ্রেন কুইনীন খাওয়া উচিত। সুস্থ শরীরে সপ্তাহে একটি বটি পালুড্রিন খাইলেও সহজে ম্যালেরিয়া হইতে পারে না।

বসন্তঃ বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক, যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগ আক্রমণের প্রারম্ভে গা-হাত-পা অত্যন্ত ব্যথা
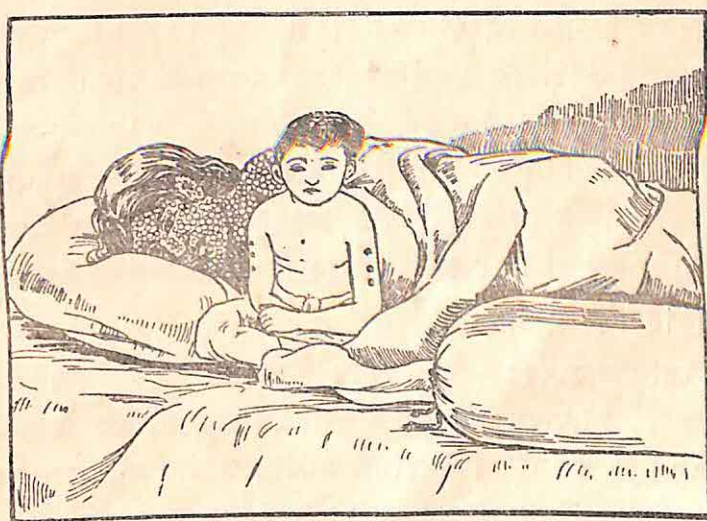
টিকাই বসন্তের নির্ভরযোগ্য প্রতিষেধক

করে ও প্রবল জ্বর হয়। তিন দিন পরে কপালে, ঘাড়ে ও কব্‌জিতে লাল লাল গুটি দেখা যায়। পরে গুটির চারিদিক লাল হইয়া উঠে।

এই গুটি সর্বাঙ্গে উঠে। গলার ভিতরে, এমন কি চক্ষের ভিতরেও এই গুটি উঠিতে দেখা যায়। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে গুটিগুলিতে জল জমিয়া ফোসকার মত দেখা যায়। নয় দিনের মধ্যে এই গুটির মধ্যে পুঁজ দেখা দেয়। সে সময়ে খুব জ্বর বাড়িতে থাকে। ক্রমশ গুটিগুলি ক্ষতে পরিণত হয়। এই সময়ে রোগীর জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। আজকাল পেনিসিলিন নামক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার ফলে বহু রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করিতেছে।

রোগ বিস্তার ঃ—বসন্ত রোগীর শ্লেষ্মা, গুটির রস, ক্ষত, মামড়ি প্রভৃতির মধ্যে রোগের জীবাণু থাকে। মামড়ি খসিয়া গেলে রোগ-জীবাণু রোগীর গায়ে ও চুলে লাগিয়া থাকে। এজন্য মামড়ি খুব সাবধানে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। বাতাসে ভাসিয়া শুষ্ক মামড়ি একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়। রোগীর সর্দিকাশির সংস্পর্শে আসিলে রোগ সংক্রামিত হয়। মশা-মাছির দ্বারাও রোগ-বিস্তার ঘটিয়া থাকে। রোগীকে পৃথক ঘরে মশারীর ভিতরে রাখিতে হয় এবং রোগীর শুশ্রূষাকারীকে অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে হয়। রোগীর ব্যবহৃত বিছানাপত্র ও কাপড়-চোপড় পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

রোগ প্রতিষেধ ঃ—রোগ হইলে চিকিৎসা করিয়া ভাল হওয়া অপেক্ষা রোগ যাহাতে না হইতে পারে সে ব্যবস্থাই সব দিক দিয়া ভাল। বিশেষ করিয়া এ রোগটি এমনই যে রোগ সারিয়া গেলেও এমন চিহ্ন রাখিয়া যায় যাহা সারা জীবনেও মুছিয়া যায় না।

বসন্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক প্রতিবৎসর নিয়মিত টিকা লওয়া। টিকার শক্তি সাধারণতঃ এক বৎসরেরও বেশী থাকে। তবুও প্রতি-বৎসরই টিকা লওয়া উচিত। কোন কারণে যদি শরীরের রোগ

প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, তাহা হইলেই আমরা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। সাবধানের মার নাই, এই কথা মনে রাখিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকিতেও টিকা লওয়া উচিত।

কলেরার জীবাণু

কলেরাঃ খাদ্য ও পানীয়ের সহিত 'কমা ব্যাসিলাস' নামক এক প্রকার জীবাণু মানুষের উদরে প্রবেশ করিলে কলেরা রোগের উৎপত্তি হয়। এই জীবাণুগুলি দেখিতে কমা চিহ্নের (,) মত বলিয়া ইহাদিগকে 'কমা ব্যাসিলাস' বলে।
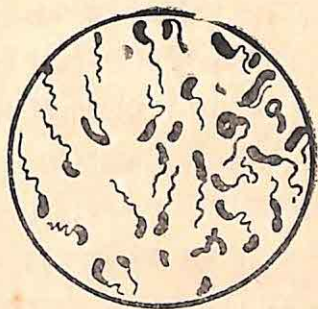
রোগের লক্ষণঃ—প্রচুর জলবৎ ভেদ ও বমি এই রোগের লক্ষণ। অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর চোখ ও গলার স্বর বসিয়া যায়, প্রস্রাব বন্ধ হয়, ও গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া হাতে-পায়ে খিল ধরে। এ রোগে যত শীঘ্র সম্ভব সুচিকিৎসকের শরণ লওয়া কর্তব্য।

রোগের বিস্তারঃ—কলেরা রোগীর মলমূত্রবমি হইতে নানারূপ কীটপতঙ্গ, বিশেষতঃ মাছি দ্বারা এই রোগ বিস্তারলাভ করে। কলেরা রোগীর মলমূত্রের উপর বসিয়া মাছি পায়ে করিয়া কলেরার জীবাণু ছড়াইয়া বেড়ায়। কলেরা রোগীর মলমূত্রবমি জলের সহিত মিশিয়া সেই জল মানুষের উদরে গিয়াও রোগ সৃষ্টি করে।

কলেরার প্রতিকারঃ—এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে সালফা গুয়ানাডিন ঔষধ ব্যবহার করা হয়। তবে ভেদবমি হইলেই সুচিকিৎসকের শরণ লওয়া উচিত।

কলেরা যখন মহামারী রূপে দেখা দেয় তখন কোন অনাবৃ

ঠাণ্ডা খাদ্য খাইতে নাই ; সকল সময়ে গরম খাদ্য খাইতে হয়। জল ভাল করিয়া ফুটাইয়া পান করিলে জলের জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। এসময়ে কখনও খালি পেটে থাকিতে নাই। দই বা টক জাতীয় পদার্থ যে-কোন প্রকার জীবাণু নষ্ট করে বলিয়া এসময়ে ঐ তীয় খাদ্য খাওয়া উচিত।

কলেরা দেখা দিলে প্রত্যেকেরই কলেরার প্রতিষেধক টিকা লওয়া উচিত। ইহা কার্যকরী হইতে সাত হইতে দশ দিন সময় লাগে ও ছয় মাস স্থায়ী হয়। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও সতর্কতা গ্রহণ করা কর্তব্য। জলাশয়, কূপ ইত্যাদির জল যেন কোন প্রকারেই কলেরার জীবাণুযুক্ত হইয়া দূষিত না হয়। রোগীর ব্যবহৃত জামা-কাপড় তীব্র জীবাণুনাশক পদার্থ মিশ্রিত জলে ধুইতে হয়। তাহা হইলে সহজে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে না। পানীয় জল ফুটাইয়া লওয়া উচিত। সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া বিশেষ সতর্কভাবে চলিলে এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

খোস-পাঁচড়াঃ খোস-পাঁচড়া এক প্রকার জঘন্য চর্মরোগ। ইহাদের জীবাণুগুলি দেখিতে অনেকটা মাকড়শার মত। ইহারা চর্মের নীচে সূক্ষ্ম সুরঙ্গ কাটিয়া বাস করে ও ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া নূতন কীট জন্মায় ও ক্রমশ ব্যাধি দেহে ছড়াইয়া পড়ে। খোস অত্যন্ত স্পর্শ-সংক্রামক। ইহার পুঁজ বা রস কাহারও গায়ে লাগিলে তাহারও এই রোগ
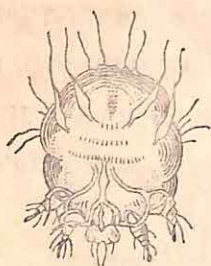
খোসের জীবাণু

রোগীর ব্যবহার করা তৈল, গামছা বা সাবানের সাহায্যেও এই রোগ ছড়াইয়া থাকে

চিকিৎসা :—আক্রান্ত স্থানগুলি গরম জলে কার্বলিক সাবান দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া নিমতৈল লাগাইলে ধীরে ধীরে এই রোগ সারিয়া যাইবে। রোগীর গামছা, কাপড় প্রভৃতি ভাল করিয়া গরম জলে ফুটাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। রোগীর নখ, চুল প্রভৃতি যেন পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। মলিন ও অপরিষ্কৃত চর্মাদিতে এই রোগের জীবাণু খুব দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এই রোগের নানাপ্রকার ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। সুচিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতীত সেগুলি ব্যবহার করা উচিত নহে।

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক সাহায্য

আকস্মিক দুর্ঘটনা :—সহসা অনেক সময় আমাদের অসতর্কতা ও অসাবধানতার ফলে নানা প্রকার দৈহিক বিপৎপাত হয়। সে সকল ক্ষেত্রে প্রথমতঃ কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে সকলেরই কিছু জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

আগুনে পোড়া : জামা-কাপড়ে হঠাৎ আগুন ধরিয়া গেলে ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে নাই। ছুটাছুটি করিলে আগুন বেশী করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কাপড়-জামায় আগুন ধরিলে মাটিতে শুইয়া গড়াগড়ি দিলে আগুন নিবিয়া যায়। খুব বেশী আগুন জ্বলিলে আগুনের উপর কম্বল, চট বা কাঁথা চাপিয়া ধরিলেও আগুন নিবিয়া যায়। জল দিয়া আগুন নিবান উচিত নয়। দগ্ধ স্থান স্পিরিট দিয়া ভিজাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হইবে। যদি কোন ফোসকা পড়ে তবে তাহা যেন গলিয়া না যায়। আলুবাটা বা চুনের জলের সহিত সমপরিমাণ জলপাই বা নারিকেল তৈল ভাল করিয়া মিশাইয়া দগ্ধ স্থানে লাগান যাইতে পারে। বার্ণল বা ট্যানিক

অ্যাসিড ঘটিত মলমও ব্যবহার করা যায়। যত শীঘ্র সম্ভব অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মচকান ও ভাঙ্গা: অনেক সময় হঠাৎ পড়িয়া গিয়া আঘাত লাগিয়া হাতে-পায়ের সন্ধিস্থান মচকাইয়া যায়। আহত সন্ধিস্থানে তৎক্ষণাৎ বরফ কিংবা ঠাণ্ডা জল দিয়া ভাল করিয়া ডলিয়া দিতে হয়। পরে খুব মিহি লবনগুঁড়া তেলের সহিত মশাইয়া মালিশ করিলে মচকান ব্যথার উপশম হয়। ইহা ছাড়া জামবাক, আয়োডেক্স প্রভৃতি মলম মালিশ করিলে মচকান ব্যথায় খুব উপকার পাওয়া যায়। হাড় স্থানচ্যুত হইলে তাহা যত শীঘ্র সম্ভব সুচিকিৎসকের দ্বারা স্বস্থানে বসাইয়া লইতে হয়। হঠাৎ পড়িয়া অনেক সময়ে হাত-পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। ভিতরে হাড় ভাঙ্গিয়াও যদি উপরের চামড়া কাটিয়া রক্ত না পড়ে, তবে তাহাকে **সরল হাড়ভাঙ্গা** বলে। হাড় ভাঙ্গিয়া চামড়া চিরিয়া বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে **জটিল হাড়ভাঙ্গা** বলে। আহত ব্যক্তিকে সত্বর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া বা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে সমর্পণ করা উচিত। আঘাতের গুরুত্ব না বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় কুফল ফলে।

ক্ষত ও রক্তপাত: কোন স্থান কাটিয়া ক্রমাগত রক্তপাত হইতে থাকিলে সত্বর রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধমনী কাটিয়া রক্ত বাহির হইলে উহা দেখিতে গাঢ় লাল রঙের হয় এবং শিরা বা উপশিরা কাটিয়া যে রক্ত বাহির হয় তাহার রং কালচে। ধমনী কাটিলে থাকিয়া থাকিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছোটে। শিরা বা উপশিরা কাটিলে একটানা ধীর স্রোতে রক্ত পড়িতে থাকে। সেখানে বরফ ঘসিয়া দিলে ঠাণ্ডায় ক্ষতস্থানের মুখের রক্ত জমিয়া

রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে। সহজে রক্তপাত বন্ধ না হইলে ধমনীর ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের উপরে অর্থাৎ যেদিকে হৃৎপিণ্ড সেইদিকে খুব চাপিয়া বাঁধন দিতে হয়। শিরা বা উপশিরার রক্তপাতও এইভাবে বন্ধ করা যায় কিন্তু সে ক্ষেত্রে যেদিকে হৃৎপিণ্ড তাহার বিপরীত দিকে বাঁধন দিতে হয়। রক্ত বন্ধ হইলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় জীবাণুনাশক ঔষধ লাগাইতে হইবে। ক্ষত-বিশেষে ডেটল জল, আয়োডিন, বেঞ্জিন প্রভৃতি লাগান হয়; গাঁদা ফুলের পাতার রসও লাগান চলে। ধনুষ্টংকার ও পুঁজ প্রতিরোধক অ্যান্টিটিটেনাস ও পেনিসিলিন ইনজেকশন লওয়া বিধেয়।

জলেডোবা ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া: জলমগ্ন লোকের সময়মত সুচিকিৎসা না হইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র জল হইতে উঠাইয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করা প্রয়োজন। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত নিজেরাই যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। প্রথমতঃ লোকটির মুখের জল-কাদা
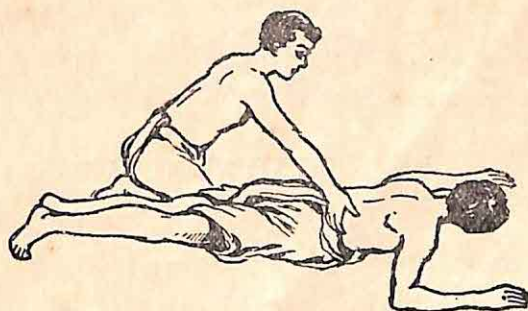
জলমগ্নের প্রাথমিক চিকিৎসা

পরিষ্কার করিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া দিবে। পেটের জল বাহির করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালু করিতে পারিলেই

রোগী মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। পেটের জল বাহির করিবার জন্য বুকের তলায় একটা পাতলা বালিশ অথবা জামা-কাপড়ের বাণ্ডিল দিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া দিয়া উপুড় করিয়া শোয়াইবে। জিবটিকে মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে! এইবার তাহার দুইখানা হাত একবার উপরের দিকে ও একবার নীচের দিকে ক্রমাগত উঠাইতে নামাইতে হইবে। হাত উপরের দিকে তুলিবার সময় বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে নাড়া দিতে হয়। ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া করিতে থাকিলে পেটের ও বুকের জল বাহির হইয়া আসিবে।

ইহার পর কাঁধের তলায় একটা বালিশ দিয়া মাথাটা একটু নীচু রাখিয়া রোগীকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিতে হয়। তাহার
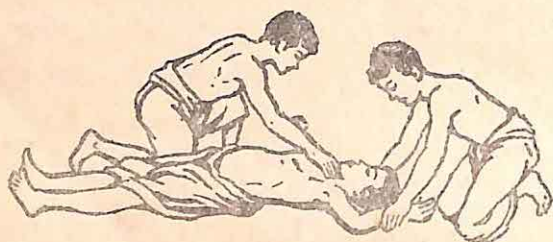
কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা

পর হাত দুইটি কনুই-এর কাছে ধরিয়া বুকের দুই দিক হইতে টানিয়া মাথার দুইপাশে লইয়া আসিতে হয়। জিবটি যেন মুখের বাহিরে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রতি মিনিটে অন্তত দশ-বারো বার এইরূপ করিতে হইবে। প্রায় আধঘণ্টা এরূপ করিলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ সহজ হইয়া আসিতে থাকিবে। যতক্ষণ রোগীর চেতনা সঞ্চার না হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া

চালাইতে হইবে। জ্ঞান হইলে রোগীর কাপড়-জামা বদলাইয়া গরম জামা-কাপড় পরাইয়া গরম জলের সেক দেওয়া প্রয়োজন। একটু সুস্থ বোধ করিলে রোগীকে একটু গরম দুধ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

বৃশ্চিক দংশনঃ কাঁকড়া বিছা দংশন করিলে দষ্টস্থানে ভয়ংকর যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় শিশুরা কাঁকড়া বিছার দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কাঁকড়া বিছা কামড়াইবার পর হুলটি তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয়। একটা বড় চাবির ফুটা দিয়া দষ্টস্থান চাপিয়া ধরিতে পারিলে বিষ বেশী ছড়াইতে পারে না। লবণজল, অ্যামোনিয়া, ওডিকোলন অথবা রেকটিফাইড স্পিরিট দিয়া বার বার ধুইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

সর্প দংশনঃ হাতে বা পায়ে সর্প-দংশন হওয়া মাত্রই দড়ি, ফিতা বা কাপড়ের পাড় দিয়া ক্ষতের কিছু উপরে হৃৎপিণ্ডের দিকে শক্ত করিয়া পর পর কয়েকটি বাঁধন দিতে হয়। বাঁধন দিলে বিষ রক্তস্রোতের সহিত হৃৎপিণ্ডে যাইতে পারে না। তাহার পর ক্ষতস্থান পরিষ্কার ছুরির সাহায্যে চিরিয়া পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের গুঁড়ার সাহায্যে শোধন করা উচিত।
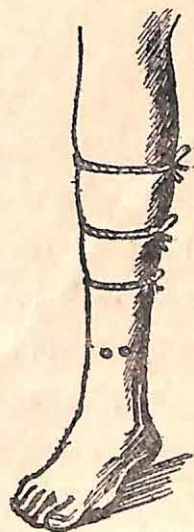
যে সাপটি দংশন করিয়াছে উহা বিষধর কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। সাপ না চিনিতে পারিলে অনেক সময় দংশনের

দাগ দেখিয়া সাপটি বিষধর কিনা বুঝিতে পারা যায়। বিষধর সাপের দংশনে পাশাপাশি দুইটি মোটা দাঁতের দাগ দেখা যায়। নির্বিষ সাপের দংশনে ছোট ছোট অনেকগুলি দাঁতের দাগ দেখা যায়। বিষধর সাপের দংশনে দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে ও চারিপাশের রক্ত নীল হইয়া জমাট বাঁধে। দষ্টস্থানটি চিরিয়া ফেলিলে কালো ঘনরক্ত বাহির হয় এবং দষ্টব্যক্তি ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। নির্বিষ সাপের দংশনে রক্ত লালই থাকে। এ ব্যাপারে ওঝা বৈদ্যের উপর নির্ভর করা নিবুদ্ধিতার কার্য।
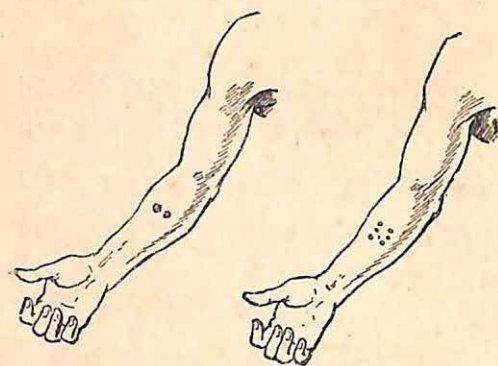
বিষধর ও নির্বিষ সাপের দংশনের দাগ

অ্যান্টিভেনম সিরাপ বিষধর সাপের একটি ভাল ঔষধ। লেক্সিন নামক ঔষধেও অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসক আনাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। সর্পদষ্ট রোগীকে বিষদোষ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কখনও ঘুমাইতে দিতে নাই।

পাগলা কুকুরের দংশন ও জলাতঙ্ক রোগ: সাধারণ সুস্থ কুকুরের দংশন মারাত্মক নয়। কিন্তু পাগলা কুকুরের দংশন অত্যন্ত মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক। যদি কোন কুকুর সুস্থ

অবস্থায় দংশন করিয়া পাগল হইয়া যায় কিংবা দংশন করিবার পরে আর জলস্পর্শ না করে কিংবা আলোক সহ্য করিতে না পারে এবং দশ দিনের মধ্যে মরিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে কুকুরটি পাগল হইয়াছিল। পাগলা কুকুরের লালায় জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু থাকে। পাগলা কুকুরে দংশনের ১৫ দিন পর হইতে আরম্ভ করিয়া ৭।৮ মাসের ভিতরে এই রোগের লক্ষণ দেখা যাইতে পারে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **লুই পাস্তরের** চিকিৎসা পদ্ধতিই ইহার একমাত্র চিকিৎসা। এই চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে রোগীর পেটে ইনজেকশন দেওয়া হয়। আজকাল প্রায় সকল নগরেই পাস্তুর প্রণালীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

কুকুরে দংশন করিলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে ক্ষতস্থান কার্বলিক অ্যাসিড দিয়া পোড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। পরে কুকুরটিকে অন্তত দশ দিন বাঁধিয়া পর্যবেক্ষণ করা দরকার। যদি কুকুরটি জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত হয় তবে উহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইবে; কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া মুখ হইতে লালা বাহির হইতে থাকিবে; পিছনের পা দুইটি অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া যাইবে এবং লেজ ঝুলিয়া পড়িবে। এই রোগ দেখা দেওয়ার দশ দিনের মধ্যে কুকুরটি মরিয়া যাইবে।

অনুশীলনী

১। জীব ও জড়ের এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য কি?

২। মটর বীজের গঠন বর্ণনা কর। মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গম বর্ণনা কর।

৩। মূল, কাণ্ড ও পাতা গাছের কি কি কাজ করে, বুঝাইয়া লিখ।

৪। ঈস্ট ও আমিবা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ঈস্ট হইতে কি কাজ হয়?

৫। মসের দেহের গঠন ও জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

৬। শ্বাসতন্ত্র ও পাচনতন্ত্রের সরল বর্ণনা দাও।

৭। অ্যানোফিলিস মশা কি ভাবে রোগ বিস্তার করে, বুঝাইয়া বল।

৮। কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিরোধ করিবার কি কি ব্যবস্থা আছে বল।

৯। কাপড়ে আগুন লাগিলে কি করা উচিত?

১০। শিরা বা ধমনী কাটিয়া গেলে কি উপায়ে রক্তস্রাব বন্ধ করিবে?

১১। জলমগ্ন রোগীর শ্বাসক্রিয়া কি ভাবে ফিরাইয়া আনিতে হয় বল।

১২। সর্প দংশনের ও পাগলা কুকুরের দংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা কি ভাবে করিবে?

সমাপ্ত